লড়াই থেকে ফেরা

বরেন বসু

ভারতী পাবলিশার্স
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

বিশ বছর আগের কথা বিশ বছর আগেকার মন নিয়ে বলা যায় না। আজকের মনে বিশ বছর আগের অনেক উত্তাপ আর উত্তেজনা থিতিয়ে গেছে, ঝ'রে গেছে অনেক ব্যথা-বেদনার তুচ্ছতা। 'রঙরুট'এর বয়েস বারো পূর্ণ হ'য়ে যাওয়ার পরেও, এখনও, সেই দিনগুলোর অনেক কথা মনের মধ্যে গুঞ্জন তোলে, অনেক মানুষ ভীড় ক'রে পাশে এসে দাঁড়ায়, অনেক দিনের অনেক ছোট ছোট ঘটনা ছবি হ'য়ে ওঠে। সেই সব কথা, মানুষ আর ঘটনার গুরুত্ব কতোখানি, সেইটাই বিচারের একমাত্র বিষয় নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, সেই কথাগুলো কতোখানি—সত্য, সেই মানুষগুলো আমাদের কতোখানি আপন, আর সেই ছবিগুলো কি পরিমান জীবন্ত।

এই লেখকের অন্যান্য রচনা—

রঙরুট

জঙ্গী ভিয়েৎনাম

মহানায়ক

নতুন ফৌজ (নাটক)

বানুরামের বিবি

প্রাক্তন

উপান্ত

বৃহত্তর সম্ভাবনা

হল্ট, হু কাম্‌স্‌ দেয়ার্‌—

ভাষণযন্ত্রে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের মতো শব্দ কয়টি বেরিয়ে এলো শান্ত্রীর কণ্ঠ থেকে।

এমনতর অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। কাজেই ঘাবড়ে যাওয়ার মাত্রাধিক্য স্বাভাবিক ভাবেই ঘ'টে থাকবে। হাত পা সর্বাঙ্গ থরথর্‌ ক'রে কাঁপছে। পা থেকে চটিটা ছিটকে বেরিয়ে গেছে অনেকখানি দূরে। পেছু হ'ঠে এসে হাতের সুটকেসটাকে ধ'রে রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। চোখ দুটো এঁটে গেছে বেয়নেটের উদ্যত ডগায়।

কয়েকটা মুহূর্ত হয়তো লেগে গেছে নিজেকে সামলে নিতে। যখন স্থির বুঝলাম, বেয়নেটের ডগাটা আর এগিয়ে আসছে না কণ্ঠনালির আরও কাছে, তখন যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'লাম। এইবার অবসর পেলাম শান্ত্রীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে।

পরম বিস্ময়ে দেখলাম, শান্ত্রীর মুখে অপার তৃপ্তির হাসি। সে হাসি দানবীয় ক্রূর। হয়তো এমনই হয় বিজেতার হাসি, যখন সে শত্রুকে ধরাশায়ী করে।

ভেবে পেলাম না, কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে একটি মিলিটারী ক্যাম্পের শান্ত্রী আমার ওপর কি ধরণের জয় আশা করে! বাঙালীর ছেলে, পরণে ধুতি, পাঞ্জাবী, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, হাতে একটি

রঙচটা আঠারো ইঞ্চি টিনের স্যুটকেস—সে যখন দিনের বেলায় এক মিলিটারী ক্যাম্পের গেটের দিকে ধীরে সুস্থে এগিয়ে আসতে থাকে, তখন কি তাকে সত্যিই এক ভীষণ শত্রু ব'লে মনে হ'তে পারে ?

কি জানি। হয়তো তাই মনে করাটাই ফৌজীশাস্ত্রের বিধান।

পরে জেনেছিলাম, আমার মিলিটারী জীবনে যে অভ্যর্থনা প্রথম দফায় পেয়েছিলাম, ও জাতীয় ব্যবহার ক্যাম্প বহির্ভূত কোন অপরিচিত লোকের সঙ্গে করা সম্পূর্ণ ফৌজীশাস্ত্র বিগর্হিত। কর্তব্য জ্ঞানের যে উৎকট পরিচয় সেই শান্ত্রীটি দিয়েছিল, সেটি তার কর্মতৎপরতার মাত্রাধিক্য। দিনের বেলায়, যখন চর্মচক্ষুতে আগন্তুক বা আততায়ী পরিদৃশ্যমান, তখন 'হু কাম্‌স্‌ দেয়ার্‌' ব'লে হুঙ্কার ছেড়ে প্রশ্ন করাটা নেহাৎই বাতুলতা। নিয়ম হচ্ছে, আগন্তুককে নিরাপদ দূরত্বে রেখে হল্ট করানো। তারপর পরিচয় জিজ্ঞেস করা।

সকালের পরিতৃপ্তিটুকু চেটেপুটে রসাস্বাদন ক'রে শাস্ত্রী প্রশ্ন করলে, ক্যা মাঙতা ইধর ?

উত্তরে বললাম, ম্যায় এক্ রংরুট হুঁ।

কোম্পানিতে পোস্টেড হ'লাম। তার মানে পুরোদস্তুর মিলিটারী জীবনের সুরু।

ভর্তি হওয়ার পর মাত্র একটা মাস কেটেছে ট্রেণিং ক্যাম্পে। কোম্পানির লোকেরা বলে, মিলিটারী জীবনে ওই মনোরম স্থানটি নাকি শ্বশুরবাড়া বিশেষ।

হয়তো তাই-ই। কড়াকড়ির বহরটা ওখানে একটু শিথিল। মোটামুটি তিনটে ব্যাপারে ঠিকমত হাজিরা দিতে পারলেই সাতখুন মাপ।

সকালে আধঘণ্টা পি, টি, অর্থাৎ ব্যায়াম। বেলা এগারোটা

থেকে চারটা পর্যন্ত টেক্‌নিক্যাল ক্লাস। আর রাত্রি আটটায় রোল্‌কল্।

তাই দেখতাম, অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে অনেকেই। কাছাকাছি যাদের বাড়ী—খাওয়ার ব্যাপারটা তারা বাড়ীতেই সারে। অনেক ক্ষেত্রে রাত্রে ব্যারাকে না থেকে বাইরেও কাটিয়ে দেয়। শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ী গিয়ে, সোমবার সকালে পি, টি'তে হাজিরা দেয়।

যাদের বাড়ী-ঘর কাছাকাছি নয়, তাদের ব্যবস্থা অন্য রকম। সে সব ব্যবস্থা বহুবিধ রকমের। বাড়ীর শাসন, পরিচিত পরিবেশের লোকভয় থেকে বহুদূরে কিছু কিছু মানুষ কেমন যেন বেপরোয়া হ'য়ে ওঠে। মদ আর মেয়েমানুষে ডুবে যায়।

বিচিত্র এক জীবন এই ট্রেণিং ক্যাম্পের। এ যেন এক ধর্মশালা। বিভিন্ন বর্ণের আর ধর্মের লোকের এখানে নিত্য আনাগোনা। আসছে, কয়েক দিন থাকছে, আবার চ'লে যাচ্ছে।

আসছে বাঙলা দেশের শহরে শহরে যে সব রিক্রুটিং সেণ্টার হয়েছে, সেখান থেকে। এক মাস, দু'মাস এখানে থেকে কাজ শিখছে। তারপর চ'লে যাচ্ছে। কেউ যাচ্ছে সোজাসুজি কোন কোম্পানিতে, আবার কতক কতক যাচ্ছে জলন্ধরের হেড কোয়ার্টারসে। সেখান থেকে তারা কোম্পানিতে কোম্পানিতে পোস্টেড হবে। যাবে ইরাকে, ইরাণে, উত্তর আফ্রিকায়, আরও না কোথায় কোথায়!

ভাসমান এই জীবনে শিকড় মাটি স্পর্শ করতে পারে না। কোন কিছুর জন্যেই মনে টান লাগে না। মানুষগুলো সবাই একক। যে যার নিজের ধান্দা নিয়ে ব্যস্ত। বন্ধুত্ব জ'মে ওঠে না। কোন বোঝাপড়া ঘ'টে ওঠে না ট্রেইনী আর ট্রেইনীতে। এ যেন সেই যাযাবর যুগের জীবন।

এমনতর একটা জীবনের মধ্যে হঠাৎই একদিন দেখা গেল, কি পরিমাণ দাহ্য পদার্থ লুকিয়ে রয়েছে ওই সীমাহীন উদাসীনতা আর নির্বিকারত্বের তলে তলে।

ট্রেনিং ক্যাম্পে মাইনে দেওয়া হয় মাসের সাত তারিখে। ছ'তারিখের রোলকলে ঘোষণা করা হয় পে-প্যারেডের কথা।

কিন্তু এপ্রিলের ছ'তারিখে বলা হ'লো অন্য কথা। এ মাসে মাইনে দিতে দেরী হবে। পে-প্যারেডের কথা পরে ঘোষণা করা হবে।

রোল্‌কল্‌ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ভীমরুলের চাকের ভন্‌ভনানি মুখরিত হ'য়ে ওঠে হাবিলদার সাহেবের "রোল্‌বল্‌—ডিস্‌-মিস্‌" হুকুমটির অব্যবহিত পরেই। অতক্ষণ মুখ বন্ধ ক'রে থাকাটা বোধ হয় পুষিয়ে নেয় সুদে আসলে সকলে একসঙ্গে কথা ব'লে।

কিন্তু সেদিন অন্ধকার মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে অন্য এক ধরণ দেখলাম। সমস্ত মাঠ জুড়ে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, তারই মাঝখানে অনেকগুলো বিড়ি-সিগারেটের আগুনের জোনাকি। চতুষ্কোণ আকারে পাড়ের মতো ঘিরে আছে সারি সারি ব্যারাক। আর সেই ব্যারাকের বেড়া ডিঙ্গিয়ে দূর দূর থেকে তির্যকভাবে ঠিকরে আসছে রেল ইয়ার্ডের আলো।

অন্যদিন অনেকক্ষণ ব'সে থাকি ওই মাঠের মধ্যে। বেশীর ভাগ দিনই একা। ওই একাকীত্বটুকু বড় ভালো লাগে। কোন কোন দিন কেউ এসে পাশে ব'সে গল্প-গুজব করে। দূরে দূরে আরও অনেকে থাকে ছোট ছোট দলে। তাদের মধ্যে কেউ গান গায়, কেউ বাঁশের বাঁশি বাজায়।

সেদিন আর বসা হ'লো না। ভীমরুলের চাকের নিত্যকার সুর সেদিন কেটে গেছে। সম্পূর্ণ নতুন এক উত্তেজনার সুর ছিটকে আসছে এদিক-ওদিক-সেদিক থেকে।

প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি, উত্তেজনার কারণটা কি!

একটু পরে হৃদয়ঙ্গম হ'লো, তলব-স্থগিতের ওই হুকুমটাই উত্তেজনার খোরাক।

অকাট্য সব যুক্তি বেরিয়ে আসছে, মাইনে যদি সময়মত না দেয়, তাহ'লে আমরাই বা সমস্ত কাজ সময়মত করবো কেন?

এ যুক্তি খণ্ডাবে কে? আর সত্যিই কেউ সে চেষ্টা করেনি। এ হুকুমে সকলেই যে সমভাবে বিপদগ্রস্ত। মাস শেষ হয়ে গেছে—পকেট সকলেরই গড়ের মাঠ। মিলিটারী মানুষের ততক্ষণই খাতির যতক্ষণ সে পয়সা ছড়াতে পারে!

আরও অনেক কথা, অতি পরিষ্কার সব যুক্তি বেরিয়ে আসতে থাকে মনের কন্দর থেকে, মাইনে যদি দেবে না, তবে কেন আমরা এসেছি এই মিলিটারীতে? আমরা চাকরী করতে এসেছি—সময়মত মাইনে চাই।

পরে জেনেছিলাম, ট্রেণিং ক্যাম্পে এই রকম একটা গোলযোগের সুযোগ ক'রে দেওয়ার জন্য ক্যাম্প কমাণ্ডাণ্ট লেফটেনাণ্ট জেম্‌স্‌কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রীতিমত জবাবদিহি করতে হয়েছিল। আর ছ'মাসের জন্যে তাঁর প্রমোশন স্থগিত রাখা হয়েছিল শাস্তি স্বরূপ।

এমন ঘটনায় মনে হ'তে পারে, মিলিটারী বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কী সহৃদয় আর সুবিবেচক! ব্যাপারটা কিন্তু অন্য রকম। মিলিটারী কর্তৃপক্ষ জানেন যে, যত হাভাতের দল এসে জুটেছে সেনা বাহিনীতে। তাদের দিয়েই কার্যোদ্ধার করতে হবে। কাজেই তাদের প্রতি ব্যবহারটা যেন আপাতদৃষ্টিতে সহানুভূতিসম্পন্নতার কাছ ঘেঁষে চলে। তাই সৈনিকদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার জন্য দুটি জিনিষের ওপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া আছে। সময়-মত খেতে দেওয়া—সে খাবার যতই অখাদ্য হোক। আর সময়-মত মাইনে দেওয়া—সে মাইনে যতই ছিটেফোঁটা হোক।

অনেক রাত পর্যন্ত জটলা চললো। মাঠ থেকে গড়িয়ে সে জটলা ব্যারাকে ব্যারাকে ছড়িয়ে পড়লো। অত্যাশ্চর্য ঘটনা, 'জেম্‌স্‌ খুড়োর পুষ্যিপুত্তুরদের' কারও টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না। এমন একটা ডামাডোলের ব্যাপারে তারা নেই! অথচ ল্যান্স-নায়েক, নায়েক, হাবিলদার, জমাদার সবই আছে ট্রেণিং ক্যাম্পে—কিন্তু এখানে তারা যেন তেমন জবরদস্ত নয়।

ব্যারাকে ফিরে আমার খাটিয়ার ওপর ব'সে আছি। ট্রেণিং ক্যাম্পে তখনও আমি অতি নতুন। তার ওপর তেমন আলাপী না হওয়ায়, চেনা পরিচিতের সংখ্যা অত্যন্ত কম। চুপচাপ ব'সে দেখছি। ভাবছি, এত যে উত্তেজনা, এ কি রাতের ঘুমের মধ্যেই শান্ত হ'য়ে যাবে!

আমার সীটের কয়েক হাত তফাতেই একটা জটলা চলেছে সেই দিকেই তাকিয়ে আছি। শুনছি তাদের প্রতিটি কথা অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে। বড় ভালো লাগছে মানুষগুলোকে।

কথা মানেই উত্তেজনা। মনের সমস্ত রাগ-ঝাল উজাড় ক'রে দিয়ে লেফটেনাণ্ট জেম্‌সের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করা।

কেমন যেন আকৃষ্ট হ'য়ে পড়লাম। ধীরে ধীরে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। এক সময়ে আমিও ব'লে বসলাম, আমাদের এতো কথাতো লেফটেনাণ্ট জেম্‌স্‌ শুনতে পাচ্ছেন না। কাজেই, কালই মাইনে দেওয়ার ব্যবস্থা করার চাড় তাঁর আসবে কোথা থেকে?

একজন চীৎকার ক'রে উঠলো, চলো শালা জেম্‌স্‌ খুড়োর কাছে।

আমি বললাম, তাতে কোন লাভ হবে না। এখন হয়তো তিনি প্রকৃতিস্থ নেই। তার চেয়ে কাল সকালে যদি আমরা সকালে পি, টি'তে ফল্‌ ইন্‌ না করি, তাহ'লে কি খুব গণ্ডগোল হবে?

কিস্‌সু না—ফুৎকারে একজন সমস্ত দ্বিধা উড়িয়ে দিলে।

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, ওই প্রস্তাবটি সিদ্ধান্ত হ'য়ে

দাঁড়িয়েছে। চার-পাঁচজনের একটা দল ব্যারাকে ব্যারাকে ব'লে যেতে লাগলো, কাল সকালে কেউ পি,টি'তে ফল্ ইন্ করবি না। যতক্ষণ না মাইনে দিচ্ছে, ততক্ষণ কোন কাজ নয়।

পরদিন সকালে যথাকালে পি,টি'র হুইসিল্ পড়লো। কেউ ব্যারাক থেকে বার হ'লো না। আশ্চর্য ব্যাপার! অসংগঠিত এক জনতা কি অটল এক সংগঠন গ'ড়ে ফেলেছে এক রাতের মধ্যে!

প্রথমে একজন ল্যান্স-নায়েক এসে বললো, চলো পি,টি'মে।

একজন হুঙ্কার ছেড়ে বললো, নহি যায়েগা। পহেলা তলব পিছে পি,টি।

ল্যান্স-নায়েকের পর নায়েক, তারপর হাবিলদার, ধাপে ধাপে সকলেই এলো আর ফিরে গেল।

তারপর ঘণ্টা খানেকের থমথমে ভাব। ব্যারাক থেকে কেউ বাইরে যায় না। বাইরে থেকে কেউ ব্যারাকে আসে না। কেমন যেন একটা ভয়-ভয় ভাব। না জানি এর পর কি!

বেলা ন'টার সময় ল্যান্স-নায়েকরা এসে ব্যারাকে ব্যারাকে ব'লে গেল, আজ পি,টি মাফ। তিন বাজে পে-প্যারেড্।

সম্পূর্ণ শান্তিতে দিনটা কেটে গেল। তবুও খুশীর উচ্ছ্বাসে বার বার কেন যেন হোঁচট লাগে। ব্যাপারটা ঠিক যেন বোঝা গেল না।

মাইনের পরদিন জন কুড়ি লোক কোম্পানিতে ট্রান্সফার হ'য়ে গেল। এমন প্রায়ই যায়। তবুও যেন এবারকার লোক নির্বাচনে কেমন যেন একটু বিশেষত্ব ধরা পড়ে।

তার দুদিন পরে আমি কোম্পানিতে পোস্টেড্ হ'লাম।

কোম্পানিতে পোস্টেড্ হওয়াটাতো তৃতীয় ধাপ।

প্রথম এনরোলমেণ্ট, অর্থাৎ ভর্তি হওয়া। দ্বিতীয়, ট্রেণিং ক্যাম্প। তৃতীয় হ'লো কোম্পানি।

. কেমন যেন মনে হ'লো মিলিটারী জীবনটাও বুঝিবা জীবতত্ত্বের দশ দশার মতন।

ভর্তি হওয়ার এক মাসের মধ্যে কোম্পানিতে এসে পড়লাম। অথচ জীবতত্ত্বে বলে, এক একটি স্তর পার হ'তে নাকি কোটি কোটি বছর লেগেছে!

যুদ্ধের কাল নির্ণয় তো স্বাভাবিক দিনের মাপে করা যায় না। এক একটি দিনই তো এক এক যুগ। এই যে উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল, যে বছর মিলিটারীতে ভর্তি হ'লাম, সেটা কি শুধুই একটা বছর! তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মাপে কি তাকে মাপা যায়! একটি যুদ্ধ যে এক যুগ।

উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের সুরু বাঙলার বুকে বিশেষ একটা রূপ নিয়ে আবির্ভূত হ'লো। সে রূপ বাঙলার মানুষের কাছে যেমন অভিনব, তেমনই বিভ্রান্তিকর। রেঙ্গুণে বোমা পড়েছে, তারপর দেখতে দেখতে সমস্ত বর্মা মুল্লুকটাই চ'লে গেছে জাপানের কবলে। চ'লে গেছে যুদ্ধ সুরুর আড়াই বছরে আরও অনেক দেশের স্বাধীনতা। ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেছে হাজার বছর ধ'রে গ'ড়ে তোলা শহর নগর। কোথাও জার্মানি, কোথাও ইতালি, আর কোথাও বা জাপানের বিজয় অভিযানের স্বাক্ষর পড়েছে শক্তিশেলের মতো!

এতদিন প্রচণ্ড উল্লাসে যুদ্ধের খবর পড়েছি। তার গতি-প্রকৃতি নিয়ে তুমুল তর্ক করেছি। চুলচেরা বিশ্লেষণ করে নিঃসন্দেহ হয়েছি জার্মানির জয় সম্বন্ধে। হিটলার যে আমাদের একান্তই আপনার জন সে নজির উদ্ধার করেছি পুরাতত্ত্ব ঘেঁটে। জার্মানি যখন ভারতে শুভ পদার্পণ করবে, তখন আমাদের করণীয় কি কি, তারও তালিকা প্রস্তুত।

এ হেন সময়ে জাপান রেঙ্গুণে বম্বিং করলো। বম্বিঙের ধরণটা কেমন যেন বন্ধুভাবাপন্ন মনে হ'লো না। অসংখ্য লোক মারা গেল। বর্মা থেকে ইভ্যাকুয়ীরা আসতে সুরু করলো ভারতের অভিমুখে।

হিসেব ক'ষে দেখা গেল রেঙ্গুণ থেকে কলকাতা খুব বেশী দূর নয়। কেন যেন মনে হ'লো কলকাতা তো তেমন নিরাপদ নয়।

সুরু হ'লো কলকাতা থেকে ইভ্যাকুয়েসন্। পাগলের মতো, অন্ধের মতো, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুট্ লাগালাম। সামনে খানা-খন্দ কি পাহাড়-পর্বত, চোখ মেলে দেখার অবসর নেই। বাড়ী-ঘর জিনিষ-পত্র ফেলে পালালাম।

কিসের আশায়?

শুধুই তো বেঁচে থাকার আশা নিয়ে। কিন্তু বাঁচতে তো পারিনি আমরা সেই অস্থির উন্মত্ত দিনগুলোতে। উনিশশো বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ প্রভৃতি যুদ্ধের বছরগুলোতে তো শুধুই মৃত্যুর খবর। কয়েক যুগের মৃত্যুকে ঘনীভূত ক'রে আনা হয়েছে কয়েক দিনের মধ্যে। বহুমুখী মৃত্যুর ব্যবস্থা তার করাল মুখ ব্যাদান ক'রে ঠিকই আমাদের জঠরাগত করেছে পরিকল্পনামত। যুদ্ধে গিয়েও মরেছি। যুদ্ধের বাইরে থাকার চেষ্টা করতে গিয়েও মরেছি। পঞ্চাশ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মরেছে। আর বর্মা থেকে পালিয়ে আসতে গিয়ে সৈনিক আর নাগরিক, দুয়ে মিলে কি তার চেয়ে কিছু কম লোক মারা গিয়েছিল?

উনিশশো বিয়াল্লিশে ভাঙনের যে ঢল্ নামলো তারই ঘূর্ণীপাকে জেগে উঠলো সেই ভূত, যে ভূতকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম ছ'টি বছর।

ভূতে পাওয়ার মতো যুদ্ধে যাওয়ার ঝোঁক আমাকে পেয়ে বসেছিল উনিশশো ছত্রিশ সাল থেকে। এ্যাবিসিনিয়ার ওপর ইতালির আক্রমণ তখন বর্বরতার সীমাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েসন্ বিজ্ঞাপন দিলে, এ্যাবিসিনিয়ায় মেডিক্যাল মিশন পাঠানোর জন্যে লোক চাই।

ধর্মতলা স্ট্রীটের আপিসে গিয়ে নাম লিখিয়ে এলাম। যেন নেশার ঘোরে দিনের পর দিন কাটে। কিন্তু মেডিক্যাল্ এ্যাসোসিয়েসন্ থেকে কোন খবর নেই পনেরো দিনের পরেও।

সেই আপিসে গিয়ে আবার হানা দিলাম।

পরম নির্বিকার উত্তর, কবে লোক যাবে তার কোনও ঠিক নেই। এমন কি, আদৌ কোন লোক পাঠানো হবে কিনা তারও কোন স্থিরতা নেই।

ছুটলাম ডাক্তার কে, এস্, রায়ের বাড়ী ল্যান্সডাউন রোডে। তিনিই সেক্রেটারী।

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি জানালেন, লোক আমরা পাঠাচ্ছি না। কিছু ওষুধ-বিষুধ আর সাজ-সরঞ্জাম পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

প্রায় চুপসে গিয়েছিলাম।

ডাক্তার রায় কি যেন ভেবে বললেন, তবে শুনছি ইণ্ডিয়ান রেড্ ক্রস্ সোসাইটি কিছু লোক পাঠাতে পারে। ওদের ওখানে একবার খবর নিয়ে দেখতে পারেন।

ডালহৌসি স্কোয়ারে এলাম। রেড্ ক্রসের আপিস বললে, আমরা লোক পাঠাচ্ছি না। শুধুই জিনিষ পাঠানো হবে। সম্ভবত দিল্লীর রেড্ক্রস্ লোক পাঠাতে পারে। জি, পি, ও থেকে খাম কিনে চিঠি লিখলাম।

কয়েক দিনের মধ্যেই উত্তর এলো। লোক চাই না। চিঠির শেষ পঙক্তিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে তাঁরা ভুলে যাননি।

তখনকার মতো যুদ্ধে যাওয়া হ'লো না। তারপর সুদীর্ঘ ছ'বছর কেটে গেছে। সে বছর ক'টার ইতিহাস আমাদের উপজীব্য নয়।

তারপর এলো উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল। শুনলাম, সরকার বাহাদুর মিলিটারী চাকরীর সদর দরজা একেবারে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। গিয়ে দাঁড়ালেই চাকরী!

কলকাতার মধ্যে যতগুলো রিক্রুটিং আপিস ছিল, তার মধ্যে শিয়ালদহেরটাই আমার সব চেয়ে কাছাকাছি। ওখানেই ভর্তি হ'লাম।

ভর্তি হওয়ার পর বুঝতে পারলাম, আমি তখন ইণ্ডিয়ান কোর্ অফ্ ইঞ্জিনীয়ার্স বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত রেলওয়ে ইউনিটের লোক। ভর্তি হয়েছি ক্লার্ক হিসেবে।

রিক্রুটিং অফিসারকে একটি মাত্র কথা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোম্পানি ওভারসীজ যাবে তো?

কোম্পানির নাম ওয়ান-ফর্টিনাইন রেলওয়ে অপারেটিং কোম্পানি।

এক মুহূর্তে নামটা হ'য়ে ওঠে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। যেন এ নামের সঙ্গে আছে বহুদিনের পরিচয়। কখন যেন ওয়ান-ফর্টিনাইনের ওয়ানটা গেছে খ'সে। অবশিষ্ট রয়েছে শুধু মাত্র ফর্টিনাইন। অর্থাৎ ফর্টিনাইন বেঙ্গলী রেজিমেন্টের কথা জুড়ে বসেছে সমস্ত মনটা।

ফর্টিনাইন বেঙ্গলী রেজিমেন্টের কথা খুব অল্পই জানি। যেটুকু জানি, হয়তো তার অনেকটাই গালগল্প। তবুও কৈশোর থেকে শোনা সেই সব রোমাঞ্চকর আর দুঃসাহসিক গল্পগুলোই তো আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে মিলিটারী জীবনের কল্পনাকে।

'ভীরু বাঙ্গালীর' ছেলেরা মেসোপটেমিয়ার প্রান্তরে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে রাইফেল নিয়ে লড়াই করছে—এযে বহুদিন বহুবার স্বপ্নে দেখা ছবি! শুধুই তো এইটুকু নয়। সেই বাঙ্গালী সৈনিকরা আরও লড়েছে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের ঔদ্ধত্যের সঙ্গে মানুষোচিত মর্যাদার দাবিতে, সাদা কালোর বিভেদের প্রাচীর ভেঙে ফেলার পণ নিয়ে। এ যে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার সংগ্রাম।

এ কোম্পানিটাও বাঙালী-প্রধান। কমাণ্ডিং অফিসার বাঙালী।

সুবেদার, জমাদার বাঙালী। কোম্পানির শতকরা নব্বইজন সৈনিকও বাঙালী।

মিলিটারী জীবনের আদ্যোপান্ত এই কোম্পানিতেই কেটেছে। দেখেছি, কোম্পানির এ চেহারা ধীরে ধীরে কেমন ক'রে বদলে গেছে— অনেকটা যেন পরিকল্পনামাফিক। প্রথম এলো একদল রাজপুত, তারপর ত্রিচিনপল্লীর ত্রিশ-চল্লিশজন, তারও পর জন ষাট-সত্তর পাঞ্জাবী। তারপর থেকে যারাই আসে, তাদের মধ্যে অবাঙালার সংখ্যাটাই প্রধান। এ ছাড়াও গোড়া থেকেই ছিল জন পঞ্চাশ বি, ও, আর, অর্থাৎ বৃটীশ আদার র‍্যাঙ্কস, যদিও তারা সকলেই কলকাতার এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। যুদ্ধশেষে কোম্পানি যখন ভেঙে দেওয়া হয়, তখন ওয়ান ফটিনাইনে বাঙালীরা সংখ্যালঘু।

কোম্পানিতে এসে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝলাম, ট্রেনিং ক্যাম্পটা সত্যিই শ্বশুরবাড়ী। পার্থক্য এর প্রতি পদে পদে। প্রথমতঃ পোষাকে। এখানে পুরো ইউনিফর্ম আর সেই ইউনিফর্ম বাকী মিলিটারী জীবনের সর্বক্ষণের জন্যে।

স্টোর থেকে পোষাকের বোঝা নিয়ে তাঁবুতে এলাম। এখানেও পার্থক্য। ট্রেনিং ক্যাম্পের ব্যারাকগুলোকে মনে হয়েছিল যেন কোন ছাত্রদের হোস্টেল। কিন্তু এখানে তাঁবু। তাঁবুর মধ্যে খাটিয়া। এক তাঁবুতে আটজন।

খাটিয়ার ওপর মালপত্তর নামিয়ে রেখে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালাম। যেদিকে তাকাই কেবলই তাঁবু। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারিদিকেই তাঁবুর সারি। সব তাঁবুই এক মাপের। সাদা সাদা তাঁবু, তার ওপর রোদ প'ড়ে যেন ঝলসে উঠছে।

তাঁবুর পাড় ঘেরা চতুষ্কোণ এক মাঠ মাঝখানে। সেই মাঠে চলেছে প্যারেড। স্কোয়াড ড্রিলের মহড়া চলেছে ছোট ছোট দলে। তাল মিলিয়ে পা ফেলা আর পায়ের তালে হাত দোলানো দেখলাম

অনেকক্ষণ ধ'রে। কেমন যেন মনে মনে ওদের সঙ্গে সামিল হ'য়ে গেলাম।

ফিরে এলাম তাঁবুর মধ্যে।

খাটিয়ার ওপর ব'সে কাপড়-চোপড় নাড়াচাড়া করতে করতে নামগুলো মনে করবার চেষ্টা করছি। বুট-এ্যামুনিসন্। নামটা বড় লাগ্‌সই।

ওই বুটের চাপেই তো গুঁড়িয়ে গেছে বাঙলার বুকের পাঁজর সেই সতেরোশো সাতান্ন সালে। ক্লাইভের বুটের চাপে যে রক্ত সেদিন বাঙলার বুক থেকে চুঁইয়ে বেরিয়ে এসেছিল, সে রক্তের ধারা তো আজও থামেনি। বৃটাশ তার বুটের তলায় এনে ফেলেছে পৃথিবীর অর্ধেকটা—তাইতো তার রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না। বুটকে এ্যামুনিসন বলা কি বৃটাশ ঔদ্ধত্যেরই প্রতীক ?

আর একটি জিনিষের নাম বড় মজাদার। হাজিফ্। স্টোর ক্লার্ক বললে, দেখুন, সরকার আমাদের ওপর কত সদয়। একটি ক'রে বো পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে।

অন্যান্য সমস্ত জিনিষের তুলনায় ওটি ক্ষুদ্রতম। মনিব্যাগের মাপের ছোট একটি কাপড়ের ব্যাগ, তার মধ্যে সূচ, সুতো, বোতাম, এমন কি একটি থিম্বল পর্যন্ত। ওই ব্যাগটাই মিলিটারী জীবনে গৃহিনীর পরিপূরক।

হাজিফকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে থিম্বলটি প'ড়ে গেল মাটিতে। উবু হ'য়ে ব'সে খাটিয়ার তলায় খুঁজছি, হঠাৎ চোখ পড়লো তাঁবুর কোণে। সেখানে ইনার ফ্ল্যাপটা ফেলা। তারই অন্তরালে কে যেন ব'সে রয়েছে।

কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম। যে ভাবে লোকটি ব'সে রয়েছে তাতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সে লুকিয়ে আছে।

কিন্তু কেন ?

আরও আঁতিপাঁতি ক'রে লোকটির মুখ দেখবার জন্যে ঝুঁকে পড়লাম। মুখ যখন দেখতে পেলাম, তখন একেবারেই চারিচক্ষুর মিলন।

চোখ মিটকি মেরে আমাকে কাছে যাওয়ার ইশারা করলে সে।

উঠে গেলাম তার কাছে। তারও মিলিটারী পোষাক। কেবল পা দুটো খালি। ব'সে আছে বাবু হ'য়ে। সামনে একটি টিনের সুটকেস। ডালার ওপর লেখা যাত্রামোহন নাথ।

কাছে যেতে ফিসফিসিয়ে বললে, আজ এসেছেন?

ঘাড় নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ।

আর কিছু না ব'লে অপলক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে থাকে। আমিই প্রশ্ন করলাম, কিছু বলবেন?

যেন একটু চমকে উঠলো যাত্রামোহন, অর্থাৎ তার চমক ভাঙলো। বললে, হাতটা ভাল ক'রে মুছে ফেলুন।

সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে থেকে কোঁচার খুঁটে হাত মুছলাম।

বললে, হাত পাতুন।

বিস্ময়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। কিন্তু যা সে করতে বলছে, তার কোনটাই এমন নয় যে প্রতিরোধ করবো। অগত্যা হাতও পাতলাম।

সুটকেসের ডালা খুলে যাত্রামোহন তার মধ্যে থেকে একটি বাতাসা তুলে আমার হাতে দিলে।

আমি তখন বিস্ময়ের শেষ কোঠায় পৌঁছে গেছি। হয়তো সম্বিৎও হারিয়ে ফেলেছি। যাত্রামোহনের সুটকেসটা সুটকেসই নয়, অর্থাৎ জামাকাপড়, মানুষের প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিস রাখার একটা
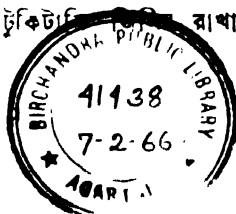
পাত্র নয়। ওটা যাত্রামোহনের ঠাকুরঘর! বিগ্রহ থেকে সুরু ক'রে একটা ঠাকুরঘরের যাবতীয় সরঞ্জাম, সবই আছে ওই স্যুটকেসটির খোলের মধ্যে। সাদা পাথরের রাধাকৃষ্ণের একটি যুগল মূর্তি, ধূপদান, ছোট্ট একটি পেতলের থালা—তার ওপর শুকনো ফুলের কয়েকটি কেশর, আর গুটি কয়েক বাতাসা। একটা শিশিতে গঙ্গাজল।

যাত্রামোহন বললে, ঠাকুরের প্রসাদ—খেয়ে ফেলুন।

কোম্পানির জীবনটাই অন্য রকম।

ট্রেণিং ক্যাম্প যে সত্যিই শ্বশুরবাড়ী, সে কথা আরও একবার স্বীকার করতে হয়। এখানে সে ধরণের ঢিলেঢালা ভাব কোথাও নেই। প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। দম যেন বন্ধ হ'য়ে এসেছিল। সমস্ত দিনটাকে স্কুলের ঘণ্টার মতো ভাগ ক'রে রুটিন বেঁধে দেওয়া। সেই রুটিনের ব্যাপ্তি, সকালে ঘুম ভাঙা থেকে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত।

প্রথম কয়েকটা দিন কাটে অদ্ভুত সন্ত্রস্ততার মধ্যে দিয়ে। সদাই ভয়, পরের রুটিন অনুযায়ী তৈরী হ'য়ে উঠতে যদি না পারি! পি, টি থেকে ফিরে বুট চড়াই, আর রোল কলের পর সেই বুট খুলি। তেরো চোদ্দ ঘণ্টা বুটের ওজন ব'য়ে পা দুটো যেন আড়ষ্ট হ'য়ে ওঠে। পায়ের শিরাগুলো ফুলে দড়ির মতো জেগে ওঠে। রোল কলের পর খাটিয়ার ওপর উঠে, মশারীর মধ্যে ব'সে নিজেই নিজের পা মালিশ করি।

কেরাণী হিসাবে ভর্তি হয়েছি। কাজেই, কয়েক দিনের মধ্যেই আপিসের কাজে ডাক পড়লো। ফলে, প্যারেড থেকে রেহাই পেলাম। পি,টি'র পর ইউনিফর্ম প'রে নিয়ে প্যারেড ফল্ ইন্'এর

হুইসিলের সঙ্গে সঙ্গে আপিসে চ'লে যাই। সেখানে কাজের ঘণ্টা কোম্পানির সাধারণ রুটিনের সঙ্গে বাঁধা নয়। সাহেবদের আলাদা রুটিন—সেই অনুযায়ী আপিস চলে।

সাহেবরা ব্রেকফাস্ট সেরে আপিসে আসেন। তার আগেই আমাদের হাজির থাকতে হয়। সাহেবরা কাজ করেন, অর্থাৎ আপিসে থাকেন প্রায় একটা পর্যন্ত—তারপর তাঁদের লাঞ্চ। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরও মেয়াদ আপিসে থাকার।

সাহেবদের লাঞ্চ মানে আমাদেরও লাঞ্চ। সাধারণভাবে কোম্পানির মধ্যাহ্ন ভোজনের রুটিনগত নাম মিড্-ডে-মিল। হয়তো সাহেবদের কথা মনে রেখেই ওই নাম দেওয়া হয়েছিল, যদিও অন্য সব সৈনিকরা এগারোটায় সুরু ক'রে বারোটার মধ্যেই ভোজনপর্ব সমাধা ক'রে ফেলে।

আমাদের, অর্থাৎ কেরাণীদের ক্ষেত্রে সব ব্যবস্থাই আলাদা। আমরা সাধারণ সৈনিকের আওতায় আসি না, আবার সাহেবদের পর্যায়েও পড়ি না। কাজেই, বেলা একটার সময়ে পেটে জ্বালা-ধরা ক্ষুধা নিয়ে ছুটি লঙ্গরখানার দিকে। ততক্ষণ অর্ধেক ধান মেশানো আতপ চালের ভাত ঠাণ্ডা হ'য়ে কড়কড়িয়ে ওঠে। ডাল, তরকারির তলানি কোনদিন থাকে, কোনদিন থাকে না। তাইতেই জঠরাগ্নি নির্বাপিত ক'রে মনের মধ্যে জ্বালা-ধরা রাগ নিয়ে তাঁবুতে ফিরে আসি।

তাঁবুতে ফিরতে ফিরতে, তাঁবুর অন্য লোকেরা বেরিয়ে পড়ে দ্বিপ্রাহরিক প্যারেডের জন্য। আমরা খাটিয়ার ওপর শরীরটাকে এলিয়ে দিই সবুট পা-জোড়া ঝুলিয়ে রেখে। ঘুমে চোখ জুড়ে আসে, তবুও ঘুমোতে সাহস হয় না। তিনটে বাজার আগেই আপিসে হাজির থাকতে হবে। ওই সময়টায় সাহেবদের আপিসে আসার কথা।

আপিসে কাজ করার ফলে আমরা হ'য়ে উঠলাম এক বিচিত্র জীব। কোম্পানির মধ্যে যারা অশিক্ষিত, তারা রীতিমত সমীহ ক'রে চলে। তাদের ধারণা আমরা তুষ্ট হ'লেই সাহেবরাও তুষ্ট। সামনাসামনি প'ড়ে গেলে, অনেক সময় রীতিবিগর্হিত এক-আধটা সেলামও ক'রে ফেলে। তাদের কাছে আমরা আধা-সাহেব।

আমাদের ওপর বিরূপ কোম্পানির শিক্ষিত সম্প্রদায়। তাদের কাছে আমরা ঈর্ষার তো বটেই, এমন কি ব্যঙ্গেরও পাত্র। ঈর্ষার কারণ, আমাদের মতো বিদ্যা তাদেরও থাকা সত্ত্বেও, তাদের প্যারেড্ করতে হয় এবং ফেটিগ খাটতে হয়। তারা যখন সারা মাঠটা লেফ্‌ট্-রাইট্-লেফ্‌ট্ ক'রে চ'ষে বেড়ায় বা চাল আটার বস্তা বয়, তখন তাঁবুর নিচে ক্যাম্প-টুলে ব'সে আমরা কলম পিষি। এরা আমাদের দিয়েছে মিলিটারী কেতাব বহির্ভূত এক খেতাব—থার্ড লেফটেনাণ্ট।

কোম্পানির কাজ রেল চালানো। তাই এই কোম্পানিতে আছে স্টেশন মাস্টার, এসিস্‌ট্যাণ্ট স্টেশন মাস্টার, গার্ড, সিগ্‌ন্যালার, পয়েন্টস্‌-ম্যান—এরা পর্যায়ভুক্ত ট্রাফিক সেক্‌সনের মধ্যে। আর আছে ড্রাইভার, ফায়ারম্যান, ফিটার, ওয়েল্ডার প্রভৃতি—এরা পড়ে লোকো সেকসনের আওতায়।

কোম্পানিটাও মূলতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত—ট্রাফিক আর লোকো। এই দুই বিভাগের জন্যে দুটি আলাদা আপিস দু'জন লেফটেনাণ্টের অধীনে। আর সবার উপর হেড্ কোয়ার্টারস্ আপিস—কোম্পানির সর্বময় কর্তা কমাণ্ডিং অফিসারের খাস দপ্তর।

আমাকে দেওয়া হ'লো ট্রাফিক আপিসে।

এখানে কাজ করতে করতে কয়েকদিনের মধ্যেই কেরাণী মনোভাবের বিচিত্র এক চেহারা দেখলাম। হেড্ কোয়ার্টারস্ আপিসের কেরাণীদের কৌলিন্য প্রশ্নাতীত। আমরা, অর্থাৎ ট্রাফিক আর লোকোর কেরাণীরা তাদের কাছে নিতান্তই করুণার পাত্র। যদিও

জাতে, অর্থাৎ কেরাণীত্বের মাপকাঠিতে—যার পরিমাপের মান হ'লো পে এবং গ্রেড্, আমরা সেই একই বিধাতার সৃষ্ট জীব।

হেড্ কোয়ার্টার্স্ ষ্টাফের আলাদা তাঁবু। সে তাঁবুতে কোম্পানির সাধারণ নিয়মকানুন কার্যকরী নয়। সুবেদার, জমাদার, যাঁরা নিয়মানুবর্তিতার অতন্দ্র প্রহরী, তাঁরা ওই খানটায় একেবারেই অসহায়। ওরা যে দিনে-রাতে খোদ মেজর সাহেবের সঙ্গে ওঠে-বসে।

আমাদের কাজ কোম্পানির লোকদের নিয়ে। তাদের সীট্ রোল, এ্যাকুইট্যান্স রোল্, কিট্ ইন্ভেণ্টরী নিয়ে।

হেড্ কোয়ার্টারস্ আপিসের কাজ দিল্লীর এ্যাড্জুটাণ্ট জেনারেল্, ডিরেক্টর অফ্ ট্রান্সপোর্টেসন্, কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল প্রভৃতি হোমরা চোমরাদের সঙ্গে।

তাদের কাছে দিল্লীর খবর—আমাদের কাছে ক্যাম্পের খবর।

আমার কাজ সীট্ রোল্ ভর্তি করা। সীট্ রোল্ একটি সৈনিকের চাকুরী জীবনের ব্যক্তিগত খতিয়ান। তখন কিন্ড্রেড্ রোল্'এর পাতাটি পূরণ করতে হচ্ছে।

জনে জনে ডেকে জিজ্ঞেস করতে হয়, তার সংসারের খবর। বিবাহিতদের স্ত্রীর নাম, সন্তানাদি, কাকে সে তার উত্তরাধিকারী করতে চায়। বৃটাশ সমাজতত্ত্বে বিবাহিত মানুষের সংসারে তার বাপ মায়ের কোন স্থান নেই। সেটা চলে অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে—তারা পারে বাবা বা মাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে।

কাজটা যত সহজ মনে হয়েছিল, কার্যকালে দেখা গেল দুরূহত্বের মাপকাঠিতে ফ্রণ্ট লাইনে দাঁড়িয়ে শত্রুর ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালানোর মতো একই পর্যায়ের।

পেন্সনের টাকা একজনকে দিলে আর সকলে বঞ্চিত হবে কিনা? সকলকেই সমান ভাগে ভাগ ক'রে দেওয়া যায় কিনা? ইত্যাদি হাজার রকমের সমস্যা নিয়ে আমি রীতিমত সমস্যা সঙ্কুল

হ'য়ে উঠলাম। অথচ পেন্সনের সর্বাধিক অঙ্ক হ'লো আট টাকা—ষোল টাকার সিপাইয়ের মাইনের অর্ধেক।

এই কাজটুকু করতে গিয়ে বৃটীশ ভারতীয় সমাজের একটি স্পষ্টতর ছবি যেন চোখের ওপর ভেসে ওঠে।

প্রতিটি মানুষই কি সাংঘাতিক অসহায়। তার সংসার, সে যেন আকাশ থেকে পড়া এক উল্কাপিণ্ড। রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোন দায়দায়িত্ব নেই সেই মানুষটার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। সে বেঁচে থাকলে, রোজগার করতে পারলে, তবে তার সংসারের মুখে অন্ন উঠবে। সে ম'রে গেলে বা অক্ষম হ'য়ে পড়লে তার সংসার পথে দাঁড়ালো। অথচ সেই মানুষটাই শুধুই তার অস্তিত্ব দিয়ে, তার বেঁচে থাকার সংগ্রাম দিয়ে, সুবিশাল এই রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতির খোরাক জুগিয়ে চলেছে, প্রত্যক্ষ না হ'লেও পরোক্ষ ট্যাক্সের সেলামী গুণে।

কাজ আমার চলেছে মন্থর গতিতে। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মন্থর হ'য়ে আসে। ওই মানুষগুলো সম্ভাব্য মৃত্যু আর উত্তরাধিকারীর প্রশ্নে সাধারণ ভাবেই বিহ্বল হ'য়ে পড়ে। কেউ কেঁদে ফেলে। কারও মুখ বিবর্ণ হ'য়ে যায়। কেউ অনর্গল তার দুঃখদুর্দশার কাহিনী ব'লে যায়। আবার কেউ কেউ গুম্ মেরে গিয়ে কিছুই বলতে চায় না।

লেফটেনাণ্ট টেরী, ট্রাফিক আপিসের ইন্-চার্জ, হুকুম দেন কাজ আরও ত্বরান্বিত করতে। কোম্পানি নাকি শিগ্গীরই মুভ্ করবে। যখন আমরা এ্যাকটিভ্ সার্ভিসে গিয়ে পড়বো, তখন আর এ কাজ করার সময় পাওয়া যাবে না।

ওদের কথায় কান দেবো না মনে ক'রেও, ওরা যেই মুখ খোলে, কেমন যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ি। দিনের শেষে, সারাদিন যা শুনি, সেই টুক্রো টুক্রো কথাগুলো একটি অখণ্ড অম্লান ছবি হ'য়ে ওঠে। সে ছবি তো তথাকথিত 'সোনার বাঙলার'!

এই মন্থর একঘেঁয়ে কাজটির মধ্যে, একদিনের জন্যে

হ'লেও, বৈচিত্র্য নিয়ে এলো তুলসিরাম, একজন বিহারী পয়েণ্টসম্যান্।

' অন্য আর সকলের মতোই তাকেও বুঝিয়ে দেওয়া হ'লো, কিন্‌ড্রেড্‌ রোল'এর ব্যাপারটা। মনে হ'লো, সে যেন অনেক সহজেই সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম ক'রে নিয়েছে। তারপর গম্ভীরভাবে একে একে সব প্রশ্নেরই উত্তর দিলে। অর্থাৎ সে বিবাহিত। তার বয়েস তিপ্পান্ন। তার স্ত্রী বর্তমান। আর আছে তার একটি ছেলে ও দুটি মেয়ে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কলম তুলে নিলাম। এইবার একে একে নাম, ঠিকানা আর বয়সগুলো লিখে নিয়ে তুলসিরামকে ছেড়ে দেবো। কোন জটিলতা সৃষ্টি না ক'রে এতো সহজে কার্যসমাধা করতে বোধ হয় আর কেউই দেয় নি।

গভীর কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তুলসিরামকে প্রশ্ন করলাম, তোমার স্ত্রীর নাম?

নির্বিকার তুলসিরামের ভ্রু দুটো মাঝখানে জোড় লেগে গেল। সে-ই আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলে, হামার ইস্ত্রীর নাম লিয়ে আপনার কি কাম্‌ বাবু?

মাথা ঠাণ্ডা রেখেই বুঝালাম, আমার কোন কাজে লাগবে না। তারই সীট্‌-রোলে লেখা থাকবে। ঘটনা যদি তেমন ঘটে, তা হ'লে তারই স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের কাজে লাগবে।

তুলসিরামের উষ্মা প্রশমিত হ'লো। কিন্তু একরাশ লজ্জা এসে জড়ো হ'লো তার মুখে চোখে। জিভ কেটে, নাক কান ম'লে বললে, ও বাত্‌ পুছবেন না বাবু। ও বাত্‌ হামি বলতে পারবে না।

জানা আছে, বাঙলা দেশের মেয়েরা স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না। সে রকম প্রয়োজন পড়লে, কাগজে লিখে দেয়। অনেক সময় শুধু বানানটা বলে।

সেই ভেবে তুলসিরামকে জিজ্ঞেস করলাম, লেখাপড়া জানো ?

তুলসিরাম লেখাপড়াও জানে না।

মহা ফাঁপরে পড়লাম। নানান্ ভাবে তাকে বুঝালাম, তার স্ত্রীর নাম, তার স্ত্রীর আর ছেলেমেয়েদের মঙ্গলের জন্যেই বলা উচিত, ইত্যাদি।

কিন্তু কোন ফল হ'লো না।

তুলসিরাম অটল।

ধমকধামক দিলাম।

তুলসিরাম ভ্রূক্ষেপই করলো না।

আপিসের সহকর্মীরা কুতুহলি হ'য়ে সিট্ ছেড়ে উঠে এলো। রীতিমত এক হট্টগোল সুরু হ'য়ে গেল। সকলে মিলে একসঙ্গে প্রশ্ন করে, ধমকধামক দেয়, কেউ কেউ আবার মারতেও তাড়া করে।

কিন্তু তুলসিরাম হিমালয়ের মত অটল।

কেউ বললে, ডাকো টেরী সাহেবকে।

আবার কেউ কেউ বললে, টেরী সাহেবের মতো ভালো মানুষের কাজ নয়। ওকে ধ'রে নিয়ে চলো মেজর চৌধুরীর কাছে। থুত্‌নিতে বক্সিঙের একটি আপার-কাট্ জমিয়ে দিলেই, শুধু বৌ কেন, বৌয়ের বোনের নাম পর্যন্ত বেরিয়ে আসবে।

তুলসিরাম ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে বারান্তরে সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছে! ব্যাপারটা যে কি ঘটেছে আর ঘটতে চলেছে, সে যেন কিছুই বুঝতে পারছে না!

টেরী সাহেব এসে হট্টগোল থামালেন। তুলসিরামকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার বৌয়ের নাম প্রকাশ করার গুরুত্ব বোঝালেন। আরও বোঝালেন, এ নামটায় আমাদের কারও কোনও প্রয়োজন নেই। শুধু প্রয়োজন সীট্ রোলের ওই পাতাটা ভর্তি করার জন্যে। নাম তাকে বলতেই হবে।

তুলসিরাম টেরী সাহেবের পা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ফেললে। নাক কান ম'লে নিজের গালে চড় মারতে লাগলো।

হুলস্থূল প'ড়ে গেল সমস্ত ক্যাম্প জুড়ে।

তুলসিরাম সেই দিনকার হীরো। সকলেই আসছে তুলসিরামকে দেখতে।

শেষ পর্যন্ত সুবেদার আর জমাদার সাহেবও এসে পড়লেন।

সুবেদার সাহেব প্রচণ্ড ধমক দিলেন, উয়ে নাম নহি বোল্‌নেসে কোয়ার্টার গার্ডমে ডাল্‌ দেগা—

সুবেদার সাহেবের কথা শেষ হাওয়ার আগেই জমাদার সাহেব তুলসিরামের হাত ধ'রে টানতে টানতে কোয়ার্টার গার্ডের দিকে কয়েক পা এগিয়ে যান। তখন আবার লেফটেনান্ট টেরী জমাদার সাহেবকে নিরস্ত করেন।

এরই ফাঁকে প্রশ্ন উঠে পড়লো, তুলসিরামের ওপর এই জোর জবরদস্তির দ্বারা 'মহারাণীর ঘোষণা' লঙ্ঘন করা হচ্ছে কিনা।

তুলসিরামের দেশোয়ালি ভাইদের ডাকা হ'লো। সকলে এক-বাক্যে রায় দিলে, 'মহারাণীর ঘোষণা' লঙ্ঘনের প্রশ্নই ওঠে না এক্ষেত্রে। স্ত্রীর নাম ধরা তাদের ধর্মবিগর্হিত কাজ নয়।

তাদের মধ্যে থেকে কেউ বললে, তুলসিরাম পাগলা আছে।

আবার কেউ কেউ বললে, ও শালা বহুৎ হারামী!

শেষোক্ত দল কেমন যেন অর্থপূর্ণভাবে মুচকে মুচকে হাসছিল।

অবশেষে তুলসিরামের স্ত্রীর নামের ঘরটায় লেখা হ'লো, রিফিউজ্‌ড টু ডিস্‌ক্লোজ্‌।

কোম্পানি মুভ্‌ করলো পনোরই মে।

মিলিটারী জীবতত্ত্বের চতুর্থ দশায় পদার্পণ করলাম। নামিয়ে

দেওয়া হ'লো জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি অতল সাগরে। এরপর কি আছে জানা নেই! কিন্‌ড্রেড্‌ রোল'এ উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হ'য়ে গেছে, অর্থাৎ ঐহিক ক্রিয়াকর্মের শেষ অনুষ্ঠানটিও সম্পন্ন!

এ যেন অনেকটা রেল চালু হওয়ার আগের যুগের তীর্থ পর্যটন। শুনেছি, তখনকার লোকে তীর্থে যাওয়ার আগে উইল্‌ ক'রে যেতো। স্বর্গলাভের আশায় ইহজীবনকে ছিন্ন-কন্থা জ্ঞান করার মতো মনের অবস্থা আয়ত্ত করতো। তারপর একদিন সুদিন দেখে গৃহদেবতার নাম স্মরণ ক'রে বেরিয়ে পড়তো পথে। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন জুড়ে দিতো মড়াকান্না। সংসার-সাধে পরিতুষ্ট সেই মানুষেরা আকুল ওই স্নেহের মায়াপাশ কাটিয়ে মুক্তির পথে যাত্রা করতো।

কিন্তু এই যে আমরা প্রায় পাঁচশো লোক ট্রেণে উঠতে চলেছি—কোথায় যাওয়ার জন্যে তা যেমন অজানা, তার চেয়ে অনেক বেশী অজানা—চলেছি কিসের আশায়!

শুধুই দু'মুঠো খেতে পাওয়ার জন্যে এতো আয়োজন—এ কথা মানতে ইচ্ছা হয় না। জীবন অর্থে যেন ভূমিষ্ট হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের মাপটাকেই বোঝায়। তার দুই প্রান্তের মাঝখানে যে ব্যাপ্তি, সেটুকু তো শুধুই 'হা-অন্ন' 'হা-অন্ন' ইস্টমন্ত্র দিয়ে ঠাসা। জননী জঠর থেকে মুক্তি পেয়েই কেঁদেছি খাওয়ার জন্যে! খাওয়ার জন্যে যে কাঙালপণা ক'রে বেড়াচ্ছি, তারই নাম দিয়েছি জীবনযুদ্ধ! আর আজ তো মরতে চলেছি খেতে পাওয়ার জন্যেই।

ক্যাম্প থেকে আমাদের স্পেশ্যাল ট্রেণ—রাস্তাটা অল্পই।

মার্চ ক'রে চলেছি। পীচ ঢালা রাস্তার ওপর পাঁচশো জোড়া বুটের আওয়াজে কিন্তু সে সঙ্গীত আজ বেজে উঠছে না, যে সঙ্গীত এতোদিন রক্তের মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়েছে। কেমন যেন মরা মাছের মতো হাজারটা চোখের সামনে সবই ধোঁয়া, কুয়াসায় আচ্ছন্ন সমস্ত পথঘাট।

এমন পথেই কি স্বেচ্ছায় এতগুলো মানুষ পা বাড়িয়ে দিলো।

ট্রেণের সামনে পৌঁছে ধোঁয়াটে দৃষ্টির আবরণ স'রে যায়। অফিসার্ আর ভি, সি, ও'দের কর্মচঞ্চলতায় আবার যেন সজীব হ'য়ে উঠি। চোখে পড়ে, আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট কামরাটার গায়ে খড়ি দিয়ে লেখা 'অফিস স্টাফ্'।

কামরায় উঠে দেখলাম, হেড্ কোয়ার্টার্স্, ট্রাফিক, লোকো আর কোয়ার্টার মাষ্টার আপিসের কেরাণীদের একত্র সমাবেশ। এমন ঘটনা ইতিপূর্বে আর ঘটেনি। মনে মনে খুশী হয়েছিলাম, স্বগোত্রীয়দের মধ্যেকার অন্তরালটা বুঝিবা ঘুচলো।

গাড়ী ছাড়ার সময় বুঝলাম, ধারণাটা আমার ভুলই হয়েছিল। ওই কামরাটার মধ্যেই চারটে দল হ'য়ে গেছে। এবং আমরা যারা পদমর্যাদায় সবচেয়ে নিচে, কেমন যেন নিজেদের অপাঙক্তেয় মনে করতে সুরু করেছি।

ট্রাফিক আপিসের সহকর্মীদের সঙ্গে তখনও তেমন বন্ধুত্ব জ'মে ওঠে নি। এ ব্যাপারে বরাবরই আমি একটু অপটু। অগত্যা দু' চারটি ভাববাচ্যে কথার পর চুপ ক'রে গেলাম। আর কথা বলার মতো কিই বা এমন ছিল, বিশেষ ক'রে ওই ক্ষণটিতে।

মনটা কেমন যেন বিমনা হ'য়ে পড়েছিল। এলোমেলো ভাবে নানান চিন্তা সমস্ত মনটাকে জুড়ে বসেছিল। ভাবছিলাম বাড়ীর কথা। আমার এই সামান্য রোজগারে কতটুকুই বা সুবাহা হবে সংসারের। তার ওপর তেমন যদি ঘটে, তা হ'লে ওই আট টাকা পেন্সন কি আরও মর্মান্তিক ব্যঙ্গ হ'য়ে উঠবে না! কিনড্রেড্ রোলে যে বাবাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছি।

নিজের ভাবনা ভাবতে ভাবতে কখন যেন কোম্পানির লোকেরা চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কোম্পানি থেকে পালিয়ে গেছে পাঁচজন। তার মধ্যে আছে

যাত্রামোহন নাথ। সে হয়তো ভয় পেয়েছে, তার ঠাকুরের শুচিতা বুঝিবা সে বজায় রাখতে পারবে না এ্যাকটিভ্ সার্ভিসে। তাই সে এক-কাপড়ে তাঁর ঠাকুরঘর-স্যুটকেস্‌টি নিয়ে, না-ব'লে কোম্পানি ত্যাগ করেছে।

আর যারা পালিয়েছে, তাদের কাকেও চিনি না। একজন রাজপুত, একজন মাদ্রাজি আর বাকী দু'জন বাঙালী।

কেমন যেন খটকা লাগে, রাজপুত ছেলেটি কেন পালায়। সে তো ভীরু নয়। তবুও তো পালায়! নিশ্চয়ই সে ইতিমধ্যে লটারীর টাকা পেয়ে যায়নি। তার অর্থনৈতিক সমস্তার কোন সমাধানই তো করতে পারেনি। তার ওপর বরণ ক'রে নিলে পলাতকের জীবন। এখন কোম্পানি থেকে খবর যাবে তার গ্রামে, জিলা সদরে, জলন্ধর হেড্ কোয়ার্টারে। ধ'রে যদি তাকে আনতে পারে, শাস্তি দেবে অমানুষিক।

ট্রেণ ছেড়ে দিয়েছে। রাত গভীরতর হ'য়ে উঠেছে। শহরের কোলাহলের বাইরে ছুটে চলেছি।

বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় নিজেকে দেখছিলাম। আমার ছাব্বিশ বছরের জীবনটা রয়েছে চোখের ওপর। মনে পড়ছে ছ'বছর আগেকার সেই দিনগুলির কথা, যখন এ্যাবিসিনিয়ার লড়াইয়ে যাওয়ার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিলাম। সেদিন যুদ্ধ দেখার আগ্রহের পেছনে মনের একটা মস্ত জোর ছিল। এক আক্রান্ত দেশের বন্ধু হ'যে সেখানে যাবো। তাদের সঙ্গে একাত্ম হ'তে পারবো।

কিন্তু আজকের এই মিলিটারী পোষাক তো মনের সেই প্রসারতা এনে দিতে পারছে না। মিলিটারী পোষাকে ক্যাম্পের বাইরে যখনই গিয়েছি, সর্বদাই সন্ত্রস্ত থেকেছি কোন পরিচিত মুখের মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে।

সেই দিক থেকে মনটা যেন খুশী হ'য়ে উঠছে। যেখানে চলেছি,

সেখানে আমার পরিচিত নিশ্চয়ই কাকেও পাবো না। স্বচ্ছন্দে চলাফেরার পথে কোন সঙ্কোচ বাধা হ'য়ে দেখা দেবে না।

কিন্তু অনুশোচনা জাগছে, কেন কেরাণী হ'য়ে ভর্তি হ'লাম। সেই তো আটক থাকতে হবে আপিসের তাঁবুর মধ্যে। খবরাখবর জানতে হবে পার্ট ওয়ান অর্ডার, বুলেটিন আর রিপোর্টের মারফত। তার বাইরে কতো কী ঘটনা ঘ'টে যাবে। তার নায়ক তো আমি হ'তে পারবো না।

অনেকক্ষণ পরে মুখ ফিরিয়েছিলাম কামরার মধ্যে। সেই প্রথম দৃষ্টিতে মোহিন্তকে দেখেছিলাম। সেই বিশেষ পরিবেশে, বিশেষ মন নিয়ে, নতুন চোখে দেখেছিলাম আর মজেছিলাম। আমারই প্রায় সমান বয়স, হয়তো বা এক-আধ বছরের ছোট। যেন একটি শানিত তলোয়ার! কি উজ্জ্বল তার হাসি! কি ধারালো তার কথা!

ইতিমধ্যে কামরাটার মধ্যে একটু পুনর্বিন্যাস ঘ'টে গেছে। হেড্ কোয়ার্টারস্ আর কোয়ার্টার মাস্টার স্টাফের মিলিত একটা দল গ'ড়ে উঠেছে।

সার্জেন্ট পীটার্স হেড কোয়ার্টারস্ আপিসের অফিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট—তিনি দলপতি। সাঙ্গোপাঙ্গ হ'লো মোহিন্ত, সেকেণ্ড ক্লার্ক। মজুমদার মশাই, পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রৌঢ়। চাদ্দা, কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার আর হাবিলদার ঘোষ, স্টোর ক্লার্ক। এই পাঁচ জনে অনেক কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি বসেছে—কি যেন একটা বোঝাপড়া ওদের মধ্যে হ'য়ে গেছে।

একটু পরে বুঝলাম, ওটা একটি পানের আসর।

ওদের মধ্যে মোহিন্ত একাই একশো। হাসছে সে-ই সবচেয়ে বেশী। কথা বলছে সে-ই সকলের ওপর। আর মদ খাচ্ছে সে আর সকলের মাত্রাকে ডিঙিয়ে। যেন জীবনীশক্তির একটা ফোয়ারা!

মদের আসর সবে সুরু হয়েছে। কয়েকজন রয়েছে শিক্ষানবীশ। কয়েক ঢোঁক খাওয়ার পর হাবিলদার ঘোষ স'রে বসেছে। চান্দা দু'হাতে বুক চেপে ধ'রে হাঁপাচ্ছে—তার নাকি দম আটকে আসছে!

মোহিন্তই চান্দার দাওয়াই বাতলে দিলে, আর পেগ্ দুয়েক খেয়ে নাও, তা হ'লেই বুকের মাঝে দম আর আটকে থাকবে না। বুক একেবারে সাফ হ'য়ে যাবে।

সত্যি সত্যিই সার্জেণ্ট পীটার্স চান্দার গলায় বেশ কড়া এক ডোজ ঢেলে দিলে। কয়েক মিনিটের মধ্যে চান্দা হড়হড় ক'রে খানিকটা বমি ক'রে ফেললে।

আপদের শান্তি হ'লো। চান্দা ধীরে ধীরে বিছানা নিলে।

ইতিমধ্যে মজুমদার মশাই উদ্দাম হ'য়ে উঠেছেন। জন্তু জানোয়ারের মতো কামুকতা ফুটে উঠেছে তাঁর প্রৌঢ় চোখে মুখে। মোহিন্তকে তিনি জড়িয়ে ধরলেন। চুমু খান অসংখ্য, তারপর তার প্যাণ্ট ধ'রে টানা হেঁচড়া করেন।

মোহিন্ত হাসছে, শুধুই হাসছে। কিন্তু শুধুমাত্র হাসি দিয়ে প্রৌঢ় মজুমদার মশাইয়ের উন্মত্ততা নিরস্ত করা যায় না। সার্জেণ্ট পীটার্স দরাজ হাতে ধেনো মদ বেশ খানিকটা ঢেলে দেয় মজুমদার মশাইয়ের গ্লাসে। সমস্তটাই গলায় ঢেলে দেন মজুমদার মশাই। কয়েক মুহূর্ত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর শূন্যে হাত ছুড়ে কিছু যেন ধরবার চেষ্টা করেন।

মোহিন্ত জোর ক'রে শুইয়ে দেয় মজুমদার মশাইকে তাঁর বিছানার ওপর। কয়েকবার তিনি উঠবার চেষ্টা করেন। তারপর এক সময়ে নিস্তেজ হ'য়ে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর প্রচণ্ড নাসিকাগর্জ্জন কামরাটাকে মুখরিত ক'রে তোলে।

মোহিন্তদের মুখোমুখি কামরার ঠিক উল্টোদিকে ব'সে আছি

গাড়ীতে আলো নেই। সেটা সম্ভবত ইচ্ছাকৃত। মিলিটারী মুভ্‌মেন্ট চরম গোপনীয়।

ওরা কিন্তু একটা হ্যারিকেন সংগ্রহ ক'রে এনেছে। সেইটা জ্বলছে ওদের সামনে। আমি ব'সে আছি অন্ধকারে। কাজেই আমার পক্ষে বিমূঢ় বিস্ময়ে ওদের কার্যকলাপের দিকে তাকিয়ে থাকার কোনই অসুবিধা নেই। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে জীবন্ত নরক দেখছি। এমনতর দৃশ্য আমার চোখের সামনে এই প্রথম।

কিন্তু আমার সমস্ত সত্ত্বাকে ছাপিয়ে এই বিস্ময়টাই প্রবল হ'য়ে উঠেছে, মোহিন্ত ওদের মধ্যে কেন! ওকে তো ওদেরই একজন মনে হচ্ছে না। অথচ ও-ই হ'য়ে উঠেছে ওদের মধ্যমণি!

রাত অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। ট্রেণ চলেছে দুরন্ত বেগে। কলকাতা ছাড়িয়ে বেশ কয়েক মাইল দূরে চ'লে গেছি। কামরার অন্য সকলে কখন ঘুমিয়ে প'ড়েছে। তাদের নাসিকাধ্বনির মিশ্রিত কলরব যেন ঝিঁঝিঁর একটানা ঐকতানের মতো শোনাচ্ছে। অনেক দুশ্চিন্তার পর তারা এখন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

সার্জেন্ট পীটার্স পাঞ্জাবের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান! নামে তিনি এ্যাংলো—বর্ণে ইণ্ডিয়ান। হলাহলের শেষ বিন্দুটুকু পান ক'রে যখন তিনি নীলকণ্ঠ, তখন দেখা গেল তাঁর বহু বিচিত্র রূপ।

এখন তিনি ক্লান্ত। মনে হচ্ছে যেন সমাধিস্থ। শরীরটা কুঁকড়ে প'ড়ে রয়েছে এক কোণে। মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। আর কিছুক্ষণ আগে, কখনও অনর্গল বকেছেন, কখনও কেঁদেছেন, আবার কখনও প্রচণ্ড হেসেছেন। মানুষের যতো ক'টা বৃত্তি, সব ক'টার রাশ যেন আলগা হ'য়ে গেছে। ওই প্রচণ্ড দাম্ভিক মানুষটা তার সমস্ত সত্ত্বা হারিয়ে ফেলে একটা গ্যাসভরা বেলুনে পরিণত হয়েছে।

এখন তিনি সম্পূর্ণ শান্ত। হয়তো বা ঘুমিয়েও পড়েছেন।

শুধু মোহিন্ত একা ব'সে আছে জানলার বাইরে মাথাটা ঝুলিয়ে। শান্ত সে সব সময়েই। শান্ত ভাবেই আক্রোশভরে একে একে সে তার সঙ্গীসাথিদের ঠাণ্ডা করেছে। বোধ হয় এমন নির্জনতাই সে এতক্ষণ কামনা করছিল!

হ্যারিকেনটা দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া উঠে চিমনিটাকে ঢেকে ফেলেছে। আলোর একটা আভাষ ওদের দিকটাকে ক'রে ফেলেছে ছায়াবৃত। এ্যাল্‌কোহলের গন্ধের সঙ্গে কেরোসিনের গন্ধ মিশে অপূর্ব এক সুবাস রচনা করেছে।

আমি জেগে আছি এই জন্যে যে, ঘুমোতে আমি পারিনি। ক্লান্তিতে আমার সমস্ত শরীর অবশ। হয়তো ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে একটুও নড়িনি। এখনও হয়তো আমার নড়বারও ক্ষমতা নেই। চোখের পাতা দুটো যদি একবার একত্র করি, ত হ'লে হয়তো আর খুলতে পারবো না।

তবুও চোখ বুজোতে পারছি না। কেবলই মনে হচ্ছে, মোহিন্ত বুঝিবা এখনই ডুকরে কেঁদে উঠবে।

ভোর হ'লো পার্বতিপুর জংসনে। কোন একটা সাইডিং লাইনে প্লেস্ করা হয়েছে আমাদের গাড়ীটাকে। আমাদের রাখা হয়েছে লোক চক্ষুর অন্তরালে।

ঘুম প্রায় সকলেরই ভেঙেছে। আমারও ভেঙেছে। উঠে বসতে গিয়ে মনে হ'লো, এ ঘুম ভাঙা আর না-ভাঙার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়! সেই তো ব'সে থাকতে হবে আধা-অন্ধকারে। আবার এই দিনের বেলায় কোন্ দৃশ্যের অবতারণা হবে, তাই বা কে জানে!

সার্জেন্ট পীটার্স উঠে ব'সে সিগারেট ধরিয়েছে। মজুমদার মশাই তখনও খোঁয়াড়ি ভাঙছেন এ-পাশ ও-পাশ ক'রে। চান্দা তার রাতের কীর্তির কথা শুনছে স্টোর ক্লার্ক হাবিলদার ঘোষের কাছে।

মোহিন্তর মুখখানা থমথম্ করছে, যেন সে সারারাত ঘুমোয়নি। এখনকার ওই মানুষটাকে দেখে কে বলবে, ওই মানুষটাই কাল রাত্রে সবচেয়ে বেশী হেসেছিল, কথা বলেছিল সবচেয়ে বেশী আর মদ খেয়েছিল সকলের মাত্রাকে ডিঙিয়ে!

এই তো গেল ওদিককার কথা। আমাদের ট্রাফিক আর লোকোর লোকেরাও জেগে উঠেছে। তারা এখন এদিক ওদিক উঁকিঝুঁকি মারছে। ট্রেণ থেকে নামা যায় কিনা, তারই জল্পনা কল্পনা করছে!

কামরার বাইরে মুখটা বাড়িয়ে দেখলাম, মস্ত এক রেলওয়ে ইয়ার্ড। তারই মাঝখানে আমাদের ট্রেণখানা দাঁড়িয়ে। দু'দিকের যে দিকে তাকাই, দৃষ্টি ধাক্কা খায় সারি সারি ওয়াগনের গায়ে। অগত্যা ট্রেণের কামরার মধ্যে মনোনিবেশ করলাম।

গাড়ি যখন দাঁড়িয়ে রয়েছে, তখন নামবার জন্যে সকলেই উদগ্রীব। একটু পা চালিয়ে হাঁটাচলা করতে পারলে, খোলা আকাশ থেকে একটু বাতাস পেলে, সজীব হ'য়ে ওঠা যায়। তারই জন্যে মনটা কেমন যেন আকুলিবিকুলি করছে।

ইতিমধ্যে ট্রেণ-পিকেটের দর্শন পাওয়া গেল। ট্রেণের দু'ধারে ডাণ্ডা হাতে বিশ-ত্রিশ হাত অন্তর অন্তর দাঁড়িয়ে গেছে। তাদেরই কাছে খবর পাওয়া গেল, আমাদের ট্রেণটাকে শিগ্‌গীরই নাকি প্ল্যাটফরমে নিয়ে যাওয়া হবে। চায়ের ব্যবস্থা নাকি সেখানেই হচ্ছে।

খানিকটা আশ্বস্ত হওয়া গেল। বিছানাপত্তর গুটিয়ে গোছগাছের হিড়িক প'ড়ে গেল। একটু পরে নজর পড়লো, এ ব্যাপারে হেড্ কোয়ার্টারস্ স্টাফ একেবারেই নির্বিকার। তারা যেন স্থানুর মতো ব'সে আছে। অগত্যা আমরা থেমে গেলাম।

ট্রেণে টান পড়লো। ধীরে ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে ট্রেণটা আগে চলছে না পিছে হঠছে, কিছুই বুঝা যায় না। দু'পাশে দুই দণ্ডায়মান ওয়াগনের সারির মধ্যে আমাদের বগীগুলো যে নড়ছে এই পর্যন্ত বোধগম্য হ'লো।

ততক্ষণে আমাদের দিক্‌ভুল হ'য়ে গেছে! না দেখতে পাচ্ছি একটু আকাশ, না চোখে পড়ছে সূর্যের আলো।

কামরার বাইরে ঝুঁকে প'ড়েও দিক্ নির্ণয়ে ব্যর্থকাম হ'লাম। অগত্যা মনকে বুঝালাম, আমরা তো আর চলছি না! আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে!

এইটুকুই খুশীর কারণ যে, ট্রেণটা প্ল্যাটফরমে চলেছে। সেখানে পৌঁছতে পারলে এক মগ চা পাওয়া যাবে, আর পাওয়া যাবে খানিকটা খোলা হাওয়া, খানিকটা আলো আর চোখ দুটোকে ছেড়ে দেওয়া যাবে দূর দিগন্তের কোলে।

. কেমন যেন এই কামরাটার আবহাওয়াটাই বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে। আমার নাকে তখনও এ্যাল্‌কোহলের গন্ধ আসছে, তার সঙ্গে মিশে রয়েছে গত রাত্রের বমির টক্ টক্ গন্ধ—তারও সঙ্গে মিশছে বিড়ি সিগারেটের গন্ধ। গত রাতের স্মৃতি আর এই গন্ধ—সব মিলে কেমন যেন একটা নোঙরা পরিবেশ। গা ঘিন্ ঘিন্ ক'রে ওঠে। ভাবতে আতঙ্ক জাগে, আজও রাত হবে—আর গত রাত্রের সেই দৃশ্যের পুনরাবর্তন ঘটবে।

মদ খেয়ে মাতলামো সকলেই করেনি। যারা সারারাত ঘুমিয়েছে, তাদের মুখে চোখে বেশ স্বচ্ছ সজীব ভাব। তারা নানা রকম মন্তব্য করছে, টিপ্পনি কাটছে। হাস্য পরিহাসে মশগুল্ হ'য়ে উঠতে চাইছে।

কিছুক্ষণেব মধ্যেই এই লঘুতার কৃত্রিমতা ধরা প'ড়ে যাচ্ছে। একটু এগিয়েই বেসুরো হ'য়ে পড়ছে, তাল যাচ্ছে কেটে। মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে নিরুদ্দেশ এই যাত্রার অনিশ্চয়তা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে, কোথায় যাচ্ছি! কেন যাচ্ছি! আবার ফিরবো তো!

প্ল্যাটফরমে ট্রেণ লাগবার পর হুকুম এলো চা নেওয়ার জন্যে ফল্‌ইন্ করবার।

ট্রেণ থেকে নেমে মগ হাতে যে যার কামরার সামনে দাঁড়ালাম।

সহসা আমি যেন চমকে উঠলাম। এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি, মোহিন্তু তার দল ছেড়ে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়েই দাঁড়িয়েছে। কারণ, সে হেড্ কোয়ার্টারস্ আপিসের লোক, যূথভ্রষ্ট হওয়াটা রীতি নয়। তবে এ রীতি লঙ্ঘন করবার সুযোগ ছিল। এখন আমরা কামরাগত ভাবে চিহ্নিত। সেই হিসাবে আমরা সকলেই অফিস স্টাফ।

কেমন যেন মনে হ'লো, মোহিন্তু ইচ্ছে ক'রেই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সকালের দিকে দেখেছি, কয়েকবার তাকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে। তবে কি গত রাতে সে আমাকে লক্ষ্য করেছিল।

মুখ ফিরিয়ে মোহিন্তুর মুখের দিকে তাকালাম। তখন পায়ে-পায়ে আমরা এগিয়ে চলেছি সিঙ্গল্ লাইনে। মোহিন্তুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হ'লো, সে মুচকে একটু হাসলে। সে হাসিটা বড় করুণ। কেমন যেন একটু লাজুকতার খাদ্ মেশানো।

চা নেওয়ার পর স্বাধীনতা পেলাম। অবাধে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারি, অবশ্য প্ল্যাটফরমের গণ্ডীর মধ্যে।

রোদ ঝলমল করছে। গ্রীষ্মকালের প্রখর রোদ। মাসটা বোধহয় জ্যৈষ্ঠের গোড়াগুড়ি। তবুও ওই প্রখর তাপ ভালো লাগলো। মনে হ'তে লাগলো, সূর্যের ওই খর তেজে যেন ডিস্ইন্ফেক্টেড হ'য়ে যাচ্ছি। মনটা যে ভাবে ভেপসে উঠেছিল, এই রৌদ্রস্নান যেন তার সবটুকু গ্লানি মুছে দিচ্ছে, সমস্ত আদ্রতা শুষে নিচ্ছে।

মোহিন্তু আমার পাশ ছাড়েনি বা আমিই হয়তো তার সঙ্গ কামনা করছিলাম। চা নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যেতে দু'জনে ফাঁকা পেলাম। পরস্পরের মধ্যে আবার দৃষ্টি বিনিময় হ'লো।

মোহিন্তই প্রথম কথা বললে, আপনার বোধহয় আমাকে খুব ঘেন্না করছে, না ?

এ ধরণের প্রশ্ন মোটেই আশা করিনি। কেমন যেন বিমূঢ় হ'য়ে পড়লাম। ঢোঁক গিলে সোজা তার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, কই, না তো!

মুচকে হেসে মোহিন্ত বললে, সে কি! আমি মদ খাই, মাতলামি করি—এইটুকুই কি সব। আমি বেশ্যাবাড়ীও যাই। এসব জেনেও আপনি আমাকে ঘেন্না করবেন না ?

বুঝলাম মোহিন্ত আমাকে আঘাত করতে চায়। সেই আঘাত হানার আক্রোশ নিয়েই সে তার অপকর্মগুলোকে এতো জোর দিয়ে জাহির করছে।

আমি বললাম, তার জন্যে আপনাকে ঘেন্না করবার কি আছে! আপনার অভিরুচিমত চলার পরিপূর্ণ অধিকার নিশ্চয়ই আপনার আছে। আপনার সঙ্গে আমার রুচির মিল না হ'লেই আপনাকে ঘেন্না করবো, এমন নীতিবাগীশ আমি নই।

মোহিন্তর আক্রমণাত্মক সুরটা যেন অনেকটা মিইয়ে গেল। খানিকটা যেন আমতা আমতা ক'রে বললে, কিন্তু যে কাজগুলো আমি করছি, সেগুলো তো খারাপ। এই যেমন মদ খাওয়া, বেশ্যাবাড়ী যাওয়া।

আমি বললাম, খারাপ কি ভালো, সে কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারিনা। কি কারণে আপনি মদ খাচ্ছেন বা বেশ্যালয়ে যাচ্ছেন সেটাতো আমার জানা নেই। আর আপনার সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানি। অথচ উড়ে এসে জুড়ে ব'সে আপনার বিচারক হ'য়ে বসবো, এতো বড় ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে মদ খাওয়া বা বেশ্যালয়ে যাওয়া একজন মানুষের শরীর এবং মন, উভয়ের পক্ষেই যে ক্ষতিকর, একথাটা অবশ্য আমি মনে করি।

মোহিন্তু সম্ভবত আমার কথায় বিস্মিত হয়েছিল। কেমন যেন একটা অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টি নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত সোজাসুজি তার সন্দেহ প্রকাশ ক'রে ফেললো।

মুখের পানে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললে, যে কথাগুলো আপনি বললেন, এগুলো কি সত্যিই আপনার অন্তরের কথা, না বলতে ভালো লাগলো ব'লে বললেন?

এ কথার উত্তরে আমাকে অনেক কথা বলতে হয়েছিল। বলেছিলাম, আপনার সন্দেহটা একবারেই অমূলক নয় মোহিন্তুবাবু। হয়তো আমার নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ আছে। জানি না, আমার মনের মধ্যে যে সংস্কারগুলো আজন্ম বাসা বেঁধে আছে, সেগুলো কখন কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু একটা কথা আমি স্থির জেনেছি, অন্তরকে বা আবেগকে সব সময়ে অন্ধের মতো বিশ্বাস করতে নেই। কারণ, আমাদের অন্তর বা আবেগ আমদেরই বিশেষ বিশেষ পরিবেশের মধ্যে গ'ড়ে উঠেছে। কিন্তু আমার বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি, নীতিবোধের এই মাপকাঠিটা একেবারেই ভুয়ো। ওর দ্বারা ভালো মন্দের বিচার হয়নি। সকলকেই একই দোষে অভিযুক্ত করা হয়েছে। সকলের ক্ষেত্রেই একই শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। মানুষের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে নীতিকে। যেন মানুষ বলতে নীতিবোধের এই ছকটাকেই বোঝায়। এমনতর নীতিবোধের আমি বিরোধী। তাই আপনার ক্ষেত্রে কোন রায়ই আমি দিতে পারছি না।

চা-পান পর্ব সমাধা হ'লো।

এইবার গিয়ে কামরায় উঠতে হবে। মনটা যেন কুঁকড়ে ওঠে।

খুশীর একটা আমেজ মনটাকে এতক্ষণ আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। মিলিটারীতে ভর্তি হওয়ার পর এই বুঝিবা প্রথম কারও সঙ্গে প্রাণ খুলে দুটো কথা কইতে পারলাম।

মোহিন্তুকে বড় ভালো লাগছিল।

আরও ভালো লাগছিল এই খোলা আকাশের নিচে গায়ে জ্বালা ধরানো রোদ্দুর, চোখ ধাঁধানো আলো আর দূর দিগন্তের ব্যাপ্তি।

কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। অগত্যা কামরার মধ্যে ঢুকলাম।

ষোলই মে বিকেলে আমিনগাঁও পৌছুলাম।

আমিনগাঁও আসাম প্রদেশের কোন শহরই নয়। ওটি একটি রেলহেড। একটি স্টেশন, বড় একটি ইয়ার্ড আর রেল কলোনি নিয়ে আমিনগাঁও। এর সঙ্গে আছে ফেরীঘাট। ব্রহ্মপুত্র নদ এখানটায় পশ্চিমবাহিনী। পাহাড় থেকে নেমে যেন এইখানটায় সমতলে এসে পড়েছে। উত্তর পাড়ে আমিনগাঁও—দক্ষিণে পাণ্ডু।

ক্যাম্প পড়লো আমিনগাঁওয়ে। জায়গাটার স্বাস্থ্য নেই, কিন্তু সৌন্দর্য আছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি ইতিমধ্যেই নেমে গেছে। সে বৃষ্টি বিরক্তিকর। একবার সুরু হ'লে আর থামে না। রাস্তাঘাট সবই কাদায় প্যাচপ্যাচে। রাতের বেলায় কোথা থেকে বেরিয়ে আসে আঙুলের মতো মোটা এক হাত লম্বা সব কেঁচো। অন্ধকারে তাদের গায়ে আগুন জ্বলে। কেঁচোর ভয়ে যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

কিন্তু সৌন্দর্য এর সর্বাঙ্গে। যে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে দূরে তাকালেই চোখে পড়বে ছোট ছোট পাহাড়ের মাথা। তারই খাঁজে খাঁজে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সবুজের সাত রঙ। আর সামনে দিয়ে ব'য়ে চলেছে ব্রহ্মপুত্র নদ। নদের নীল জল দুরন্ত বেগে নেমে চলেছে বাঙলার মাটিতে—সেখানে তার নাম যমুনা।

একেবারে ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের মাঠ আর বাড়ী। মাঠে আমাদের ক্যাম্প পড়লো। ছোট মাঠ, রেলিংএর ধারে ধারে

ঘেঁষাঘেঁষি তাঁবু। কেমন যেন মনে হয়, ছেলেবেলায় দেখা কর্ণার্জুন থিয়েটারের সীন—কুরুক্ষেত্রের দৃশ্য।

ইনষ্টিটিউটের মাঠের সামনে পীচ ঢালা রাস্তা, তারপরই নদীর পাড়। মেজর চৌধুরীর মধ্যেও যে কবিত্ব ছিল, সেটা জানা গেল আমিনগাঁও ক্যাম্প পত্তন করার সময়ে। নদীর পাড়ে, প্রায় ঢালুর গা ঘেঁষে পড়লো অফিসারদের তাঁবু আর অফিসার্স মেস্। সেই লাইন বরাবর পড়লো ই, পি, টেন্টে কোম্পানি আপিস।

আপিসে বসলেই চোখে পড়ে নদীর বুকটা। কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে যেন মাথা ঘুরে ওঠে। সাঁই সাঁই ক'রে নেমে চলেছে হিমালয়ের পদধৌত পুণ্যবারি মর্ত্যের মানুষের কল্যাণে। এখানে ব'সে কিন্তু দেখি, কচুরি পানার দঙ্গল, কোন একটি কুটিরের চাল ভেসে চলেছে—কোন লোকালয়কে ভাসিয়ে, কোন গৃহস্থকে গৃহহীন ক'রে। দুঃখ, ব্যথা অনুভব করার আগেই মুগ্ধ হ'য়ে যাই নদের পৌরুষ দেখে।

আমিনগাঁওয়ে এসে আমাদের জীবনধারায় এলো আমূল পরিবর্তন। পি, টি; প্যারেড সর্বস্ব জীবন গেল বদলে। এখানে আমরা শুধুই সৈনিক নই—তারও ওপর গার্ড, স্টেশন মাস্টার, ড্রাইভার, ফায়ারম্যান ইত্যাদি।

বোধহয় এরই নাম এ্যাকটিভ সার্ভিস্।

আপিসকে ঢেলে সাজা হ'লো। ট্রাফিক আর লোকো সেক্‌সনের স্বতন্ত্র আপিস গেল বাতিল হ'য়ে। রইলো শুধু হেড কোয়ার্টারস্ আপিস। কিন্তু তারও আভিজাত্য একটু খর্ব হ'লো। ট্রাফিক আর লোকো আপিস থেকে একজন ক'রে লোক নেওয়া হ'লো—তারা ওই দুই সেক্‌সনের ডিউটি রস্টার রাখবে।

ট্রাফিক আপিস থেকে আমাকেই বাছাই করলেন লেফটেনান্ট টেরী! সাহেবের নেক্‌নজরে পড়া চাকুরী জীবনের যে পরমতম

সৌভাগ্য, এ কথা আমার জানা ছিল। তবুও প্রমাদ গুনলাম। কারণ, এই সৌভাগ্য আমার জীবনে এনে দিলো বন্দীদশা। আপিস তাঁবুটাই হ'য়ে উঠবে আমার যুদ্ধক্ষেত্র।

হেড কোয়ার্টারস্ স্টাফের আভিজাত্যবোধ যেন একটু শিথিল হ'য়ে এলো। একে তো আমরা দু'জন ঢুকে পড়েছি! তার ওপর আমাদের সঙ্গে ট্রাফিক আর লোকোর বহুলোক সেই নিষিদ্ধ এলেকায় প্রবেশের অধিকার পেয়ে গেছে। নানান রকম তাঁদের কাজ আপিসের সঙ্গে। গার্ড ডিউটিতে যাবে—তাকে দিতে হবে তার সাজ সরঞ্জাম আর রেশন। স্টেশন মাস্টার, পয়েন্টসম্যান, সিগন্যালার্ আর ক্লার্করা ডিউটিতে-যাওয়ার সময় হাজিরা দিয়ে যাবে।

আমার কাজ কোম্পানি শুদ্ধ লোক নিয়ে।

আমিনগাঁওয়ে এসে সকলেই 'লাইনে' বার হ'তে লাগলো। এই 'লাইন' যেন প্রতি মুহূর্তে হাতছানি দিতে থাকে।

স্টেশন মাস্টার আর সিগন্যালাররা স্টেশনে স্টেশনে মোতায়েন হ'লো। গার্ডরা ঝাণ্ডা বগলে নিয়ে ট্রেণের ব্রেক্ভ্যানে গিয়ে উঠলো। এমন কি অন্য সমস্ত ক্লার্করা আমিনগাঁও আর পাণ্ডুর ইয়ার্ডে ইয়ার্ডে টালি ক্লার্কের কাজে বহাল হ'য়ে গেল।

কোম্পানির লোকেরা যখন কাজে যায়, তখন আমি ব'সে থাকি কোম্পানি আপিসের টুলের ওপর, সামনে টেবিল নিয়ে। কেমন যেন মনে হয়, ওরা এই নতুন দুনিয়াটায় কত কি দেখছে। আমিই শুধু ব'সে আছি তাবুর খুঁটিগুলোর মতো অনড়, অটল। কেমন যেন কান্না পেতো।

ওই যারা লাইনে যায় আসে, তাদেরই কাছে খবর শুনি—বর্মার ইভ্যাকুয়ীদের কথা। আসছে হাজারে হাজারে, পথে মরেছে হাজারে হাজারে, ঘর-দোর যথাসর্বস্ব খুইয়ে লাখে লাখে নাকি পথে বেরিয়েছে। জীবন, সংসার, সাধ, আশা—সবই চুরমার হ'য়ে গেছে। তবুও তারা

আসছে। মরতে মরতে আসছে। আসতে আসতে মরছে। যে যুদ্ধের সঙ্গে আমাদের কোন সংশ্রব নেই, যে যুদ্ধকে ভারতবাসী ঘৃণা করে—সেই যুদ্ধেরই বলি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ ভারতের লোক!

হেড আপিসের একটা তাঁবু। তার মধ্যে স্টাফদেরই বসতে হয় যথেষ্ট ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে। তার ওপর সব অফিসাররা যদি বসতে চায়, তাহ'লে সকলে মিলে বসা চলতে পারে, কিন্তু কাজ করা যায় না।

অবস্থা বুঝে টেরী সাহেব আমাকে ডেকে নিয়ে যান তাঁর নিজের তাঁবুতে। কাজ কর্ম, আদেশ নির্দেশ ওই তাঁবুতে ব'সেই বুঝে নিই। তারপর কখন যেন গল্পগুজব সুরু হ'য়ে যায়।

টেরী সাহেবের অপার কৌতূহল আমার মিলিটারী-পূর্ব জীবন সম্পর্কে। যথেষ্ট দ্বিধা সঙ্কোচ নিয়ে কথা বলতে সুরু ক'রে, এক সময়ে সবিস্ময়ে দেখি আমাদের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর কখন গেছে খ'সে। প্রাণখোলা কথাবার্তায় আমরা মশগুল্ হ'য়ে উঠেছি। টেরী সাহেবের ব্যাটম্যান আমাদের সামনে রেখে গেছে দু'কাপ চা।

দিনে দিনে কাজের চাপ বাড়তে লাগলো।

টেরী সাহেব মহা আনন্দে তাঁর সেকসানের সব লোককেই লাইনে পাঠাতে লাগলেন। আপিসের সময়ের সীমাবদ্ধতা ক্রমশই ঘুচে যেতে লাগলো! সারা দিনরাতটাই আমার আপিসে কাটে।

রাতের বেলায় খাওয়া সেরে আপিসে এসে বসি। রাতের ডিউটিতে আপিসের আইন কানুন প্রযোজ্য নয়। প্রয়োজনীয় শুধু আমার উপস্থিতি। টেরী সাহেব তাঁর সেকসনের প্রতিটি লোকের হিসাব চান। শুধু কয়েকটা সংখ্যা দেখে খুশী হ'তে পারেন না।

কাজেই আমাকে নিখুঁতভাবে হিসাব রাখতে হয় ক'জন গার্ড

সেদিন বুকিং পেলো। ক'জন অফ্ ফ হ'য়ে সেদিন ক্যাম্পে ফিরলো। ষ্টেশন মাস্টার, সিগন্যালার, ক্লার্ক—কোথায় কখন কোন্ সিফ্‌টে ডিউটিতে গেল। ক'জন সিক্ হ'লো। কে হাসপাতালে গেল। কে সুস্থ হ'য়ে আবার ফিরে এলো, ইত্যাদি।

রাতের ডিউটিতে তাই প্রায় বারোটা পর্যন্ত জেগে থাকতে হয়। এগারোটার সময় একটা দল ডিউটিতে যায়। তারা গিয়ে যাদের রিলিভ্ করে, তাদের ফিরতে ফিরতে প্রায় বারোটা বাজে। তারপর আমি ঘুমোতে পারি। বিছানা আমি পেতে নিই আপিসের মধ্যেই।

সেদিনেও, নিত্যকার মতোই রাত ন'টার পর এসে আপিসে বসেছি। বই সংগ্রহ করা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার। তাই কোনদিন ব্রহ্মপুত্রের কালো জলের দিকে তাকিয়ে ভাবি, কোথায় ছিলাম—কোথায় এসেছি, কোথায় আছি—এর পরই বা কোথায় যাবো!

রণক্ষেত্র এখনও বহু দূরে। কিন্তু বহু দূর থেকে যাওয়ার জন্যে তো আর রণক্ষেত্র তৈরী হয়নি। একদিন তো এগিয়ে আসবেই। তখন কি ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক আকাশে শ্বেত সাম্রাজ্যের বদলে পীত সাম্রাজ্যের উদয় হবে! যদি তাই-ই হয়, তাহ'লে কি আমরা এমনই থেকে যাবো!

কখন এক সময়ে ক্যাম্পের কলরব থেমে গেছে। আপিস আর ক্যাম্পের মাঝখানে পীচঢালা রাস্তাটা আরও কালো হ'য়ে উঠেছে। নিশুতি ক্যাম্প থেকে অনেক মানুষের নিদ্রিত শ্বাসপ্রশ্বাসের ঐকতান ভেসে আসছে। রাইফেল সোল্‌ডার আর্ম ক'রে প্রহরারত শান্ত্রী টহল দিচ্ছে। তার বুটের খট্-খট্ আওয়াজ ক্রমশঃই যেন মুখর হ'য়ে উঠছে।

বুঝলাম দশটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। ক্যাম্পে লাইট্ আউট্ হ'য়ে গেছে। সমস্ত রাতটা পরম নিশ্চিন্তে মানুষগুলো ঘুমোবে। গাঢ় ঘুম তাদের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে দেবে।

চিঠির প্যাড্ আর কলমটা নিয়ে বসি টেবিলে এসে। হ্যারিকেনের কলটা ঘুরিয়ে দিই আরও এক পাক। এক সময় কাগজ, কলম আর মন একাকার হ'য়ে যায়। পাতার পর পাতা লিখে যাই, তবুও যেন লেখা শেষ হ'তে চায় না। জীবনের যতো কথা, সবই যেন কলমের মুখ বেয়ে বেরিয়ে আসতে চায়।

কি রকম খস্ খস্ একটা শব্দ হ'লো আপিস-তাঁবুর সামনে।

চক্ষুস্থির হ'য়ে গেল।

আসছেন মেজর চৌধুরী আপিসের দিকে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। গোড়ালীতে গোড়ালী ঠুকে এ্যাটেন্সান হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ আওয়াজ করলাম। খালি মাথায় সেলাম জানানোর ওইটাই রীতি।

মেজর চৌধুরী এসে টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। পরণে তাঁর স্লীপিং স্যুটের পায়জামা, আর গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি। কি সুঠাম সুগঠিত দেহ! হাতের পেশীগুলো কি মজবুত! মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেইদিকে দেখছিলাম।

হঠাৎ টেকুর তোলার শব্দে মুখ তুলে তাকালাম। মেজর চৌধুরীর চোখে চোখ পড়লো। স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। ঘোলাটে ওই দৃষ্টির সামনে কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকে। মেজর চৌধুরীকে সকল অবস্থায়, সকল সময়েই, ভয় করতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু এখনকার ভয় অন্য জাতের। এ যেন খাঁচার বাঘ ছাড়া পেয়ে সামনে এসে দাঁড়ানোর ভয়।

মেজর চৌধুরী টলছেন। টেবিলটা ধ'রে তিনি টাল্ সামলাচ্ছেন। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এখন তিনি কমাণ্ডিং অফিসার মেজর চৌধুরী নন। এখন তিনি মেজর চৌধুরী নামক একজন অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি। কেমন যেন মনে হচ্ছে, এখনই বুঝি তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন হিংস্র বাঘের মতো। অথবা তিনি আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে উঠতেও পারেন।

অথচ এই মানুষটাই এই কোম্পানির পাঁচশো লোকের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর বৃটিশ সাম্রাজ্যের তিনি একজন সেনানায়ক!

হঠাৎ তাঁর গলার স্বর শুনে চমকে উঠলাম। কি যেন তিনি একটা বললেন! ভয়ে এতদূর বিব্রত হয়েছিলাম যে, তাঁর কথাটাও কানে যায় নি।

বললাম, বেগ্ ইওর পার্ডন্ স্যার।

জড়ানো সুরে বললেন, হু আর ইউ ?

রোজ তিনি আমাকে এই আপিসে দেখছেন একটানা পনেরো দিন ধ'রে। তবুও আমাকে তাঁর অপরিচিত মনে হওয়ায় বিস্মিত হ'লাম না। এখন তাঁর আমার মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি জীবকে মনে রাখার মতো অবস্থা নয়। না জানি কি এখন তাঁর মনোরাজ্যে বিচরণ করছে।

বললাম, আই এ্যাম্ দি ক্লার্ক অন্ ডিউটি।

আরও একটু ঝুঁকে পড়লেন টেবিলের ওপর। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার জন্যে দু'পা পিছিয়ে গেলাম। তখন মরিয়া হ'য়ে ভাবছি, কি ক'রে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে আর যেন বরদাস্ত করতে পারছি না।

তিনিই আমাকে যেন আলোকবর্তিকা দেখালেন। বললেন, হোয়্যার ইজ্ মণ্ডল ?

বললাম, হি ইজ্ স্লীপিং ইন্ হিজ টেণ্ট স্যার্। সুড্ আই বল্ হিম ?

নো, আই ডোণ্ট নীড্ এনি বডি।

কেমন যেন ভারী গলা, কান্না ভেজা স্বর! কানাঘুষোয় শুনেছি, তাঁর পারিবারিক জীবন নাকি তেমন সুখের নয়। অনেক বঞ্চনা, অনেক মিথ্যাচার তাঁদের দাম্পত্য জীবনের স্তরে স্তরে লুকিয়ে আছে।

বুঝলাম আর দেরী করা চলে না। সুবেদার মণ্ডলের নাম যখন করেছেন, তাঁকেই ডেকে দিই।

টেবিলের পেছন থেকে আরও খানিকটা দূরে স'রে গিয়ে দূরত্বের মাপটা বজায় রেখে আপিসের বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই হঠাৎ তিনি হুঙ্কার ছাড়লেন, ডোণ্ট মুভ—ইউ ফুল্।

অত জোরে চেঁচাতে গিয়ে তিনি যেন একটু টাল হারিয়ে ফেললেন। সেই ফাঁকে দৌড়ে আমি চ'লে গেলাম সুবেদার সাহেবের তাঁবুতে।

সুবেদার মণ্ডল এবং জমাদার সরকার দু'জনেই উঠে এলেন আমার সঙ্গে। আপিসের সামনে এসে দেখি মাটির ওপর মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছেন মেজর চৌধুরী।

সুবেদার মণ্ডল আর জমাদার সরকার তাঁকে তুলে নিয়ে গেলেন তাঁর তাঁবুতে।

ক্যাম্পের ছেলেরা সুবেদার মণ্ডল আর জমাদার সরকারকে ব'লে থাকে, মেজর সাহেবের নন্দি-ভৃঙ্গি।

মাস ঘুরতে না ঘুরতে আবার এলো নড়ার পালা।

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কতখানি পরিবর্তন ঘ'টে গেছে ইতিমধ্যে, আমাদের লেফট্-রাইট্-লেফট্ করা জীবনে বুদ্ধিগোচর হওয়ার কথাও নয়। চর্মচক্ষে দেখি বর্মা-ইভ্যাকুয়ীদের আসার পালা তখন শেষ পর্যায়ে। আমিনগাঁও স্টেশন সাফ হ'য়ে গেছে। থার্ড ক্লাস ওয়েটিং রুম্ নামক চালাটা তখন ফাঁকা। আমাদের ওপর স্টেশনে না যাওয়ার হুকুমটা তখন অনেক শিথিল।

অনেক তোড়জোড়, বাঁধাছাঁদা, কয়েকদিনের অক্লান্ত ফেটীগের পরিসমাপ্তি ঘটলো পাণ্ডুতে এসে। আমিনগাঁও আর পাণ্ডু, ব্রহ্মপুত্রের দুইপারে দুই ফেরীঘাট আর রেলহেড্।

মনঃক্ষুন্ন হয়েছিলাম আমরা। এ যেন পর্বতের মুষিক প্রসব!

পরে বুঝলাম, পাণ্ডুতে আসার তাৎপর্য অনেক গভীর। আমরা নাকি সমরাঙ্গন এলেকায় প্রবেশ করলাম, অর্থাৎ আমরা তখন রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত সৈনিক। দৈনন্দিন জীবনের রুটীন দিয়ে বুঝতে পারিনি, কি ভাবে কার সঙ্গে তখন আমরা যুদ্ধরত।

কিন্তু আমি বুঝেছিলাম হাড়ে হাড়ে ওই আপিস তাঁবুতে ব'সে। ট্রাফিক সেক্‌সনের দুশোখানা পে-বুকে পাঁচটাকা ফিল্ড সার্ভিস বাট্টার অঙ্কটা একদিনের মধ্যেই তুলে দিতে হয়েছিল।

চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। শত্রুবিমান একখানাও চোখে পড়েনা আকাশে। জোর ক'রে নিঃশ্বাস টেনেও নাকে আসে না বারুদের গন্ধ বাতাসে ভেসে। আমাদের জীবনে যথাপূর্বং তথা পরং।

তবুও ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তট্ এলেকা তখন সমরাঙ্গন! বর্মার সম্পূর্ণটাই তখন জাপানের দখলে। জাপানী ফৌজ তখন মনিপুর রাজ্যের সীমান্তে ঘাঁটি গেড়েছে। ভারতে প্রবেশের পথ ওই মনিপুর রাজ্যের প্রবেশ দ্বার দিয়ে নাগা পাহাড়ের পথ ধ'রে।

মনিপুর রাজ্য থেকে দুটি রাস্তা। একটি দিয়ে পৌছানো যায় কাছাড়ে—নাম বিষেণপুর রোড। কিন্তু ও রাস্তাটা নাকি অতি জরাজীর্ণ—কার্যত অচল। অপর রাস্তাটি দিয়ে পৌছানো যায় আসামের ডিমাপুরে—নাম মনিপুর রোড। এইটাই তখনকার চালু রাস্তা। আর ভারতের পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধের সমস্ত ধকলটা গেছে ওই রাস্তাটিরই ওপর দিয়ে।

পাণ্ডুতে এসে আবার নতুন ব্যবস্থা। টেরী সাহেব তাঁর নিজস্ব আপিস চালু করলেন। আর সেই আপিসের আমিই একমাত্র ক্লার্ক। হেড কোয়ার্টারস্ আর ট্রাফিক, দুটি আপিস পাশাপাশি। আভিজাত্যের লড়াই তখন অনেক নিষ্প্রভ। দুই আপিসে তখন এক সহযোগীতার আবহাওয়া—দুয়ের সেতু মোহিন্ত।

মোহিন্তর সঙ্গে পরিচয়টা ঘন হ'য়ে উঠেছে। প্রায়ই এসে গল্প গুজব করে। নিছক গল্পগুজব। তার মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের কোন উল্লেখ থাকে না। মোহিন্ত বুঝতে পেরেছে, সত্যিই আমি তাকে ঘৃণা করি না, এমন কি তার ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে নাক গলিয়ে মাতব্বরীও করতে চাই না।

দিন যায়। ধীরে ধীরে যেন বুঝতে পারি, কেন এই এলেকাটা সমরাঙ্গন ব'লে চিহ্নিত। জাপান একপাল গরু তাড়ানোর মতো বৃটীশ সিংহকে বর্মা থেকে বিতাড়িত করেছে। বাধা দেওয়ার মতো একটা ঘাঁটিও নেই এই বিশাল এলেকা জুড়ে। তাই নীতির দিক থেকে বৃটীশ সেদিন জাপানকে আরও ছড়িয়ে পড়বার সুযোগই ক'রে দিয়েছিল —কৌশলের দিক থেকে পশ্চাদপসরণই ছিল একমেবাদ্বিতীয়ং।

কিন্তু আমরা তখন নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদী। দুনিয়া জোড়া এই যুদ্ধ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ফ্যাসিজম্ আর গণতন্ত্র একই জিনিষ।

আমরা বৃটীশের পদানত—কাজেই বৃটীশ বিরোধী। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্য আবেদন নিবেদন আর মাঝে মাঝে গণআন্দোলনের চাপ সৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মনে প্রাণে আমরা কামনা করি বৃটীশের পরাজয়। তাই আমরা হ'য়ে উঠলাম জার্মানি আর জাপানের ভক্ত।

জার্মানি আর জাপান বৃটীশকে কোনঠাসা করছে—কাজেই তারা বীর। আমরা বীরের পূজা নির্লজ্জের মতো সুরু করলাম। নিজেরা আমরা সংগঠিত হ'লাম না। গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকে স্বাধীনতার সংগ্রামে রূপান্তরিত করার এতো বড় সুযোগ গ্রহণ করলাম না।

বৃটীশের পরাজয়ে আমরা উল্লসিত হ'লাম। বৃটীশের ওপর প্রতিটি আঘাত আমাদের জাতীয়তাবাদী সঙ্কীর্ণতাকে উগ্রতর ক'রে তোলে। আমরা বৃটীশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হ'য়েও অধৈর্য হ'য়ে

পড়ি, জাপান কেন আরও এগিয়ে আসছে না। পথ তো তার সামনে পরিষ্কার। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণতট কেন, বাঙলা দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ার পথে বাধা দেওয়ার মতো শক্তি তখন বৃটীশ সরকারের ছিল না।

পাণ্ডু ক্যাম্প পত্তনের তৃতীয় দিন থেকেই কোম্পানির বিকেন্দ্রীকরণ সুরু হ'লো। পাণ্ডু থেকে চাপারমুখ স্টেশনগুলোর ভার কার্যত আমাদের ওপর এসে পড়লো। পাণ্ডু থেকে লামডিং সেকসনে আমাদের কোম্পানির গার্ড, ড্রাইভার, ফায়ারম্যানরা অধিকাংশ ট্রেণগুলোর ভার নিয়ে নিলে।

জাপান যদি একান্তই এগিয়ে আসে, সিভিলিয়ান রেলওয়ে স্টাফের ওপর যে নির্ভর করা যাবে না, সে কথা সরকার বুঝে নিয়েছে। তাই আমরা মিলিটারী উর্দি চাপানো ভারতীয়েরাই সরকারের ভরসাস্থল। আর আমরা যে রণে ভঙ্গ দেবো না, তার গ্যারান্টি, ঘরে ঘরে আমাদের হাড়ি যে শিকেয় উঠেছে!

এলো উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের আগস্ট।

ভারতের রাজনৈতিক আকাশে বাতাসে এক থমথমে ভাব। পাণ্ডুতে ব'সেই নানান রকম খবর শুনি। মুখে মুখে খবর তার ডালপালা বিস্তার ক'রে এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি করলো। চাপারমুখ ডিট্যাচমেন্টের ছেলেরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তাদের জন্য পাঠানো হ'লো দুটো রাইফেল আর একশো রাউণ্ড গুলি। ভাবটা যেন, ওই দুটি রাইফেল দেখলেই দেশশুদ্ধ মানুষ ভয় পেয়ে যাবে।

নয়ই আগস্টের পর কেটে গেল আরও পনেরোটা দিন। ঠিক নির্বিঘ্নে নয়। আসামেও কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছিল। সে ঘটনা সাধারণভাবেই সীমাবদ্ধ কিছু কিছু সৈনিককে পথে-ঘাটে লাঞ্ছিত

করার মধ্যে। আর কয়েকটা ক্ষেত্রে মিলিটারী ক্যাম্পের ওপর আক্রমণের প্রচেষ্টায়।

'সেগুলো নিছক ঘটনাই। আসামের আনাচে কানাচে তখন সেনা-ছাউনী। ভ্রূণেই এই বিপ্লবী প্রচেষ্টা বিনষ্ট হ'লো, আন্দোলনে আর পরিণত হ'তে পারলো না।

এই সময়ে একদিন টেরী সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, বোস, জলন্ধরে যেতে পারবে ?

টেরী সাহেব জানতেন, জলন্ধর কেন, পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যেতে আমি সানন্দে রাজী।

আমাকে আর উত্তর দিতে হয়নি। মুখ দেখেই আমার মনের কথা বুঝেছিলেন।

বললেন, তাহ'লে তৈরী হ'য়ে নাও। সঙ্গে একজন ব্যাটম্যান্ নাও তোমার পছন্দমত। সম্ভবত কাল, না হ'লে পরশু রওনা হ'য়ে যেতে হবে। হয়তো তোমার ভ্রমণ খুব সুখের হবে না। কিন্তু আমি জানি, সেইজন্যেই তুমি এই ভ্রমণ আরও বেশী পছন্দ করবে।

সে রাত্রে ঘুমোতে পারিনি। মশারীর মধ্যে শুয়ে থেকেও থেকে-থেকে বিছানার ওপর উঠে বসেছি। অসম্ভব একটা উত্তেজনায় সমস্ত শরীর গল্‌গল্‌ ক'রে ঘামতে সুরু করেছে।

সঙ্গে নিলাম রফিককে।

মহম্মদ রফিক, পয়েন্টস্‌ম্যান। যমদূতের মতো চেহারা। যেমন কালো তেমনই কদাকার। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ তাকে দেখলে যে কোন মানুষই প্রথমটা চমকে উঠবে। শরীরের তুলনায় মাথাটা বড়। মুখটা থ্যাবড়ানো, চওড়ার দিকে একটু বেশী—একেবারে চৌকো। মদ সে মিলিটারীতে ভর্তি হওয়ার আগে যথেষ্ট খেয়েছে—তাই মিলিটারীতে ঢুকে আর নতুন ক'রে মোহ জাগেনি। তবুও সব সময়েই চোখ দুটো তার জবাফুলের মতো লাল। কালো কালো পুরু

ঠোঁটের অন্তরালে ঝক্‌ঝকে সাদা দাঁতগুলো ওকে যেন আরও ভয়ঙ্কর ক'রে তোলে। লম্বায় তেমন বেশী না হ'লেও বেশ সুগঠিত দেহ, রীতিমত শক্তিমান।

এ হেন রফিক আমার সঙ্গের সাথী। আমার এই দীর্ঘ যাত্রাপথ, যার সম্বন্ধে তখন আমার কোন ধারণাই ছিল না, সেই অচিন যাত্রাপথের সে কাণ্ডারী।

রফিক আমাকে প্রথমেই অভয় দিয়ে বলেছিল, কিছু ভাববেন না বোস বাবু, সব আমি ঠিক ক'রে দেবো।

রফিকের এ কথার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা আমি রেখেছিলাম, আর তার জন্যে কোনদিনই আমাকে পরিতাপ করতে হয়নি।

রফিক আমাকে সত্যিই ভালোবাসতো। তার ভালোবাসা আমার মিলিটারী জীবনে কোনদিনই হারাতে হয়নি। সার্জেন্ট পীটার্স বা মোহিন্ত অনেক সময়ে বলতো, তোমার ওই রফিকটি আস্ত একটি আল্‌সেসিয়ান্।

সর্বদাই আমি এমনতর উক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি। প্রশংসাসূচক অর্থে একটা মানুষকে কুকুরের সংজ্ঞা দিয়ে অভিহিত করা যে কতখানি অন্যায়, সে সম্বন্ধে মাঝে মাঝে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাও দিয়েছি। কিন্তু ওরা কোনদিনই ওদের মন্তব্য প্রত্যাহার করেনি।

রফিক হাওড়ার টিকিয়াপাড়ার মানুষ। তখন তার বয়েস গোটা ত্রিশের মতো। তার মিলিটারী পূর্ব জীবনে সে ছিল ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান। তার জীবনেতিহাস এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। কয়েকবার সে জেল খেটেছে টুকিটাকি নানান অপরাধে। খুবই সলজ্জভাবে বলেছে, খুন জখমও দু'চারটে তার হাত দিয়ে হ'য়ে গেছে।

কোম্পানিতেও তার রেকর্ড এমন কিছু উজ্জ্বল নয়। এন্, সি, ও'দের সে বরদাস্ত করতে পারে না। একবার একজনকে রীতিমত উত্তম-মধ্যম দিয়েছিল। তারই ফলে তাকে আঠাশ দিন সশ্রম কারাদণ্ডও

খাটতে হয়েছে। তার জন্যে সে দুঃখিত নয়। তার মতে ক্যাম্পের তাঁবু আর কোয়ার্টার গার্ডের তাঁবুর মধ্যে তফাৎটা তো শুধু নামে, কাজে তো দুই ই এক।

এই কারাদণ্ড ভোগের সময়েই টেরী সাহেব রফিককে আবিষ্কার করেন।

পাণ্ডুতে এসে আবার যখন ট্রাফিক আপিস চালু হ'লো, তখন তার আস্তানা হ'লো একটি একশো আশী পাউণ্ড তাঁবুর মধ্যে। সেই ট্রাফিক আপিসের তাঁবু খাটানোর ফেটিগ হচ্ছে আমার তত্ত্বাবধানে। আমি হাবিলদার ক্লার্ক ব'লে আমাকে কোম্পানি থেকে লোক দেওয়া হয়নি। কোম্পানির লোকের ওপর আমার হাবিলদারী খাটে না, যেহেতু হাবিলদার ক্লার্কের কোন ডিসিপ্লিনারী ক্ষমতা নেই। সুতরাং আমাকে দেওয়া হয়েছে কয়েকজন কয়েদী।

জনচারেক কয়েদী কাজ করছে। তার মধ্যে রফিকও আছে। টেরী সাহেবের পছন্দটা গিয়ে পড়লো রফিকের ওপর। সব কাজই তিনি রফিককে বলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রফিক হ'য়ে গেল কয়েদীদের লীডার।

কয়েদীদের মধ্যে আর যারা ছিল, তাদের মধ্যে জনদুয়েক 'বাবু' জাতের লোক, অর্থাৎ একজন গার্ড আর একজন সিগ্‌ন্যালার। তাদের কয়েদী হওয়ার সঙ্কোচ, ফেটীগ খাটার সঙ্কোচ—রাজ্যের সঙ্কোচ নিয়েই তারা জড়সড়।

এক সময়ে দেখা গেল, তাদের পাশে সরিয়ে দিয়ে রফিক একাই দৈত্যের মতো কাজ ক'রে চলেছে।

সেইদিনই টেরী সাহেব তাকে বেছে নিলেন তাঁর কোম্পানি আপিসের অর্ডারলি হিসাবে।

কোম্পানি-আপিস টেণ্টেই আমাকে থাকতে হয়। কাজ আমার দিন রাতের। সারা দিন আপিস চলে। সন্ধ্যের পর থেকে আপিসের

অন্য চেহারা। আমার আর রফিকের বিছানা পাতা হয় ওই আপিস-তাঁবুর মধ্যেই।

আমি না হয় রফিক, এক জনকে আপিসে হাজির থাকতেই হয়। গার্ডদের জন্যে কল্-বুক আসে স্টেশন থেকে। সেই গার্ডদের ডেকে দিতে হয়। তার সমস্ত সাজ সরঞ্জামের জোগাড় দিয়ে যথা সময়ে তাকে পাঠিয়ে দিতে হয় স্টেশনে। তা ছাড়াও আসে স্টেশন মাস্টার, সিগ্ন্যালার্, পয়েণ্টস্ম্যানরা সিফ্‌ট ডিউটি শেষ ক'রে। তাদের হাজিরা নিতে হয়। আবার নতুন দল ডিউটিতে যায়—তাদেরও হিসাব রাখতে হয়।

কাজেই কোম্পানি আপিসই হ'য়ে উঠলো আমার আস্তানা: সন্ধ্যে হ'লেই দু'খানা টেবিল জোড়া লাগিয়ে, বিছানা পেতে, মশারী টাঙিয়ে নিই। আর পাশেই থাকে রফিক—দুটো প্যাকিং বাক্সের ওপর বিস্তারা লাগিয়ে, মচ্ছরদানি খাটিয়ে। তাঁবুর মাঝখানের খুঁটিতে বাঁধা দড়িতে ঝোলে একটা হ্যারিকেন। রাত যখন ঝিমিয়ে আসে, হ্যারিকেনটা কমিয়ে দিই। সেই স্তিমিত আলোয় মশারীর মধ্যে শুয়ে শুয়ে রফিকের জীবনের গল্প শুনি।

সেই রফিকই হ'লো আমার পথ-পরিক্রমার সহচর। অবশ্য মিলিটারী ভাষায় ব্যাটম্যান্, অর্থাৎ খাস্ খানসামা।

বিচিত্র এক অভিযানে বার হ'লাম।

আমার দিক থেকে অভিযান হ'লেও, কোম্পানির দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিউটি। কোম্পানির সমস্ত লোকের সীট রোল পৌঁছে দিতে হবে নাম্বার টু টি-টি-সি'র অফিসার ইন্ চার্জ অফ রেকর্ডস্'এর দফতরে।

রওনা হ'লাম আসামের পাণ্ডু থেকে। যেতে হবে পাঞ্জাবের

জলন্ধর। ভারতের পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম সীমান্ত। সুদীর্ঘ পথ। এই পথই ছিল আমার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

তারিখটা সঠিক মনে নেই। সম্ভবত চব্বিশ কিম্বা পঁচিশে আগষ্ট।

রওনা হ'লাম সন্ধ্যাবেলা। সঙ্গে রেলওয়ে ওয়ারাণ্ট, মুভ্‌মেণ্ট অর্ডার; কমাণ্ডিং অফিসারের একটি 'টু হুম্‌ ইট্‌ মে কনসার্ণ' চিঠি। তার বিষয়বস্তু হচ্ছে—চলেছি মিলিটারী ডিউটিতে, পত্রবাহককে যেন তার কর্তব্যকর্মে সব রকম সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়।

পাণ্ডু ঘাটে এসে 'গুর্খা' ষ্টীমারে উঠলাম। এই ষ্টীমারটি পাণ্ডু-আমিনগাঁও পারাপারের ফেরী ষ্টীমার নয়। এই ষ্টীমারে আমাদের যেতে হবে ধুবড়ি।

আমিনগাঁও থেকে গোলোকগঞ্জ জংসন বিচ্ছিন্ন। মাঝখানে বেকী ব্রীজ ধ্ব'সে গেছে। আগষ্ট আন্দোলনের ফলে নয়, আসামের বর্ষায়। এ রকম নাকি কয়েক মাসের জন্যে প্রায় প্রতি বছরই যায়।

আমাদের রুট্‌ হ'লো পাণ্ডু থেকে ধুবড়ি—ষ্টীমারে। মিটার গেজ লাইন ধ'রে ধুবড়ি থেকে গোলোকগঞ্জ, গোলোকগঞ্জ থেকে পার্বতিপুর। ব্রড্‌ গেজ লাইনের সুরু পার্বতিপুর থেকে। সেখান থেকে শিয়ালদহ। তারপর হাওড়া থেকে জলন্ধর। প্রায় দু'হাজার মাইল পথ, আর চারদিনের ভ্রমণ।

সন্ধ্যার ঘুটঘুটে অন্ধকারে ষ্টীমারে উঠলাম। সমরাঙ্গন এলেকার ফৌজ আমরা, আমাদের গতিবিধি আরও বেশী গোপনীয়। তার ওপর সঙ্গে আমাদের দুটি প্যাকিং বাক্স। ওই বাক্স দুটির মধ্যেই বুঝি বা লুকানো আছে কোম্পানির প্রাণ ভোমরা-ভোমরি! এক একটির ওজন অন্তত পক্ষে আধমণ ক'রে।

কোম্পানি থেকে আরও একটি দল সেইদিনই আমাদের সঙ্গে রওনা হ'লো। হাবিলদার মেজর হরিকিষণ আর দু'জন সিপাই।

তারা যাচ্ছে কোম্পানি থেকে পলাতক একজন কয়েদীকে পাঞ্জাবের কোন এক শহরের পুলিশ হেফাজত থেকে নিয়ে আসতে।

'গুর্খা' ষ্টীমারটা দেখে যদিও আমার ওটাকেই একটা জাহাজ ব'লে মনে হয়েছিল, কিন্তু ওটা ষ্টীমারই। অবশ্য ওইটাই নাকি বরিশাল লাইনের সবচেয়ে বড় ষ্টীমার। কমপক্ষে দু'হাজার লোক ওতে যাতায়াত করতে পারে। বেকী ব্রীজ্ অচল হ'য়ে পড়ার ফলে, বরিশাল, চাঁদপুর প্রভৃতি লাইনগুলোকে আধা-অচল ক'রে দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখা হয়েছে।

ধোঁয়ায় ভরা আধা-অন্ধকার ফেরীঘাটে দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ অন্ধকার ষ্টীমারটা। আমাদের কোম্পানির আমরা পাঁচজন গিয়ে উঠলাম আপার ডেক্'এ, টর্চ জ্বেলে পথ দেখে।

হাবিলদার মেজর বললেন, চল বোস, ষ্টীমার যখন খালি, আমরা গিয়ে কেবিনে বসি।

আমার তা ইচ্ছা নয়। আপার ডেক্'এর ওপর ব'সে সামনের সমস্ত কিছুই দেখতে দেখতে যাবো। কেন ঢুকবো গিয়ে কেবিনের ওই খুপ্‌রিতে।

রফিককে সে কথা বললাম।

রফিক তখনই ডেক্'এর ওপর বিস্তারা লাগিয়ে দিলে।

সবচেয়ে মুক্তির আনন্দ অনুভব করলাম, এখানে আর মচ্ছরদানি খাটাতে হবে না।

ততক্ষণে হাবিলদার মেজর সাহেব ফিরে এসেছেন। দেখলাম, তাঁর সিপাইরা ডেক্'এর ওপরেই বিছানা পাততে সুরু করেছে।

বললাম, কি হ'লো হাবিলদার মেজর সাহেব, কেবিন থেকে যে চ'লে এলেন?

হাবিলদা'র মেজর সাহেব ক্ষুদ্ধস্বরে বললেন, ওখানে এক শালা ইংরেজ মেজর রয়েছে। কাজ নেই ওদের ধারে কাছে গিয়ে। হয়তো

এখনই পা টিপতে বলবে। আসছে নাকি বর্মা থেকে হেঁটে। চলেছে ওর হেড্‌কোয়ার্টারসে।

কোম্পানি চৌহদ্দির মধ্যে এ ধরণের কথা হাবিলদার মেজর কখনই বলতেন না। সেখানে তিনি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী—একজন সাধারণ মানুষ ন'ন। কিন্তু এখানে তাঁর পদের বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। তাই তিনি সরল একটি মানুষ, মুখ ফুটে মনের কথা বলতে পারেন।

তবু হাবিলদার মেজর হরিকিষণ যেন পুরোপুরি কর্তৃপক্ষ তরফের লোক নয়। মেজর চৌধুরী এখন নাকি আক্ষেপ করেন হরিকিষণকে হাবিলদার মেজরের পদ দেওয়ার জন্যে। ওর সবচেয়ে বড় অপগুণ, কোম্পানির ছেলেরা ওকে নিজেদের লোক মনে করে।

হরিকিষণ পাঞ্জাবের হিন্দু। লম্বায় ছ'ফুট। মোটা কাছির মতো পাকানো তার চেহারা, গলাখানা তার বাজখাঁ। কিন্তু ছেলেরা জানে, হরিকিষণ যতখানি গলায় ততখানি বর্ষায় না। খুব মিশুক, গল্প করতে পেলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। বাঙলা শেখার ভয়ানক সখ। বাঙালীদের সঙ্গে বাঙলা ছাড়া কিছুতেই কথা বলবে না। যতো ভুল বলে ততো হাসে। মিলিটারি জীবনে হাবিলদার মেজর হ'য়েও প্রাণ খুলে হাসতে পারে। প্রচুর হাসে।

স্টীমার ছাড়লো প্রায় রাত ন'টায়। ছাড়লো ওর ছ'জন যাত্রীকে নিয়েই। আমাদের কোম্পানির পাঁচজন আর বর্মা প্রত্যাগত সেই ইংরেজ মেজর।

প্রথমে স্টীমারটা কেঁপে উঠলো। তারপর দুলে উঠলো। কিছুক্ষণ পরে অনুভব করলাম, আমরা এগিয়ে চলেছি। জেটিঘাটের কিনারের আলোগুলো যেন পেছিয়ে যাচ্ছে।

আষাঢ়ের বর্ষাকাল। আকাশ জোড়া ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে ঢেকে আছে। তারই ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে-পড়া চাঁদের আলোয় একটা ধূসর

রূপ নিয়েছে সমস্ত আকাশটা। সে আলোয় নদীর তটভূমিকে আলোকিত করতে পারেনি। আবছায়া কতকগুলো রেখা যেন মোটা মোটা কালির আঁচড়ে নিঃসীম অন্ধকারের পটভূমিকায় ফুটে উঠেছে।

রাতের খাওয়া ক্যাম্পে সেরে এসেছিলাম। সারা রাতের জন্যে আর কোন দুর্ভাবনা নেই। ব'সে আছি ডেকের ওপর সামনের ঘন কালো অন্ধকারের দিকে চেয়ে। ষ্টীমার এগিয়ে চলেছে। ভিজে হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগছে মুখে চোখে। বড় ভালো লাগছে। শুধুই ভালো লাগছে। নিত্যকার রুটান-বাঁধা জীবনের বাইরে এই অবসরটাকে মনে হচ্ছে এক অখণ্ড অবকাশ।

পাশাপাশি পাঁচখানা বিছানা। আমারটা এক ধারে। চেয়ে দেখলাম, সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমারও ঘুম পেয়েছে, কিন্তু ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না। কেবলই মনে হচ্ছে, জীবনে এমন একটি ক্ষণ আর কখনও আসবে কি। ঘুমিয়ে এমন ক্ষণটিকে হারিয়ে ফেলতে মন যেন কেঁদে উঠে।

মৃদু পায়ের আওয়াজ পেলাম। চমকে পিছনের দিকে তাকালাম। কেবিন থেকে বেরিয়ে আসছেন সেই ইংরেজ মেজর। ধীরে ধীরে এসে রেলিং ধ'রে দাঁড়ালেন। তারপর বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন অপলক দৃষ্টিতে।

আমার মনে বিচিত্র এক ভাবনা এলো। ওই মানুষটা জাতে বৃটীশ। পদমর্যাদায় মেজর। আমাদের রাজার জাত। আমার সঙ্গে ওর ফারাক্ দুস্তর। তবুও কেন যেন মনে হ'লো, এই মুহূর্তে ওই মানুষটার আর আমার মনের অবস্থা হুবহু এক।

কিছুই ওর ভালো লাগছে না। এই দুনিয়া জোড়া যুদ্ধের সঙ্গে ওর কোনই সম্পর্ক নেই। ও যুদ্ধ চায়নি, সাম্রাজ্য চায়নি, জয় পরাজয় নিয়ে কোন মাথাব্যথা ওর ছিল না। ও চেয়েছে

কর্মঠ একটা জীবন। খাটবে-খুটবে, রোজগার করবে, খেয়ে প'রে ওর সংসার নিয়ে সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকবে।

তবুও, কারা যেন ওকে টেনে এনেছে এই যুদ্ধের মধ্যে। কেন, কি কারণে, তা ও উপলব্ধি করতে পারে না। কেবল শুনেছে স্বদেশকে রক্ষার জন্য উদাত্ত আহ্বান! খবর-কাগজে পড়েছে, স্বদেশ ও জাতির জন্য মহান আত্ম-বলিদানের অগ্নিগবাণী। তাই তাকে তার স্বদেশ ছেড়ে আসতে হয়েছে সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে বর্মায়, ভারতে!

কিন্তু ওর কি ব্যক্তিগতভাবে জার্মানি বা জাপানের ওপর কোন আক্রোশ আছে? জার্মানি বা জাপান কি কোথাও ওর স্বার্থে আঘাত করেছে? কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না ওই সরল মানুষটা। কেন জাপান বা জার্মানিকে ধ্বংস করতে হবে, কেন পৃথিবীর বুকে ইউনিয়ন জ্যাকে সবার উপরে উড্ডিন রাখতে হবে—তার কোন খেই খুঁজে পাচ্ছে না।

আমারই মতো ওরও কাছে জার্মানি বা জাপান বহু সুদূর।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরে এক সময়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন মেজর সাহেব। এই নিশুতি নিস্তব্ধ রাতে হয়তো সাহেবের নিজেকে বড় একা-একা মনে হয়েছে। হয়তো মনে পড়েছে সাত সাগরের পারে বাড়ীর কথা। হয়তো ছেলে-মেয়েদের কচি কচি মুখগুলো ভেসে উঠেছিল সামনের নিকষ কালো অন্ধকারের পটে। হয়তো বা স্ত্রীর অশ্রুসিক্ত মুখখানা বারবার মুখের সামনে এগিয়ে এসেছিল।

তাই মেজর সাহেব আমাকে ডেকেছিলেন। আমাকে মানে একজন অধস্তনকে নয়, আর একজন মানুষকে। যে মানুষকে অন্তত সেই মুহূর্তে নিছক একজন মানুষ ব'লেই মনে হয়েছিল। দেশ, জাতি, সম্পর্ক, কোন কিছুই সেখানে বিভেদের কোন সীমারেখা টানতে পারেনি।

কথা বিশেষ কিছু হয়নি। অত্যন্ত মামুলি গোটা কয়েক কথা। তা'ও থেকে থেকে, অনেকক্ষণ বাদে বাদে।

আসলে কথা বলার জন্যে তিনি আমাকে ডাকেননি। ডেকেছিলেন একজন মানুষকে পাশে পাওয়ার জন্যে। যে একাকীত্ব তাঁর কাছে পীড়াদায়ক হ'য়ে উঠেছিল, তারই বেদনা ঘুচাতে। তাঁর অনুভূতির মধ্যে, তিনি যে নিঃসঙ্গ ন'ন, শুধু এই বোধটাকে উপলব্ধি করতে।

অনেকক্ষণ পাশাপাশি নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর এক সময়ে 'গুড নাইট' উইশ্ ক'রে তিনি কেবিনে চ'লে গিয়েছিলেন। আমি, তারও পর আরও কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, সময়টা ঘড়ি ধ'রে দেখিনি। ওই বৃটাশারের কথাই সারাক্ষণ ভেবেছি। চৌত্রিশ দিন ধ'রে পথ হেঁটে মান্দালয় থেকে মনিপুর এসে পৌঁচেছেন। এই চৌত্রিশ দিনের মধ্যে অধিকাংশ দিনই তাঁকে অভুক্ত থাকতে হয়েছে। কখনও কখনও কাঁচা চাল চিবিয়ে খেয়েছেন, কখনও বা আঁচলা ভ'রে নালার জল আকণ্ঠ পান করেছেন। এ সব সত্ত্বেও তিনি বেঁচে আছেন, এই কথাটি তিনি কয়েক বার বলেছেন। তিনি যে বেঁচে আছেন, এইটাই তাঁর কাছে প্রচণ্ড এক বিস্ময়।

এক সময়ে আমিও এসে বিছানা নিলাম। শোয়ার আগে নিদ্রিত সাথিদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম। ওরা নীরব হয়েছে ব'লেই যেন ওদের আরও বেশী মুখর মনে হচ্ছে। ওদের মুখের ওপর যেন ফুটে উঠেছে ওদের অন্তরতম কথাগুলো।

আমার পাশেই বিছানা পেতেছে রফিক।

রফিকের মুখের দিকে চাইলাম। এই আধা-অন্ধকারে ওর কদাকার মুখখানা তো ভয়াবহ মনে হচ্ছে না। বরং যেন মনে হচ্ছে, ওর এই গাঢ় ঘুমের মধ্যেও সে আমার সম্বন্ধে প্রখর সজাগ।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো রফিকের ডাকে

চা প্রস্তুত। কোম্পানি পথের রসদ কিছু কাঁচা মাল সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। রফিক ইতিমধ্যে মাঝি মাল্লাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়ে সেইগুলোর সদ্ব্যবহার করেছে !

তখন বেশ বেলা হয়েছে। দূরে দেখা যাচ্ছে ধুবড়ি শহর। ব্রহ্মপুত্র ওইখানটায় বেশ বড় রকমের একটা বাঁক খেয়েছে। সকালের আলোতেও যেন এপার ওপার যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। আমাদের মতো শহুরে লোকের কাছে সমুদ্রের স্বাদ এনে দেয়।

আমরা তখন মাঝ দরিয়ায়। ঢেউয়ের ধাক্কায় ষ্টীমারটা শুধু কাঁপছে। আমরা যে তখন চলছি না, এ কথা বুঝতে একটু সময় লেগে গেল। যখন বুঝলাম, তখন বিস্ময়ের অন্ত নেই।

সমস্ত ষ্টীমারটাই যেন আমাদের এক্তিয়ারে। ছুটলাম সারেঙ সাহেবের কাছে। জিজ্ঞেস করলাম, আমরা দাঁড়িয়ে কেন ?

সারেঙ সাহেব বললেন, এখানে অনেকগুলো চড়া আছে। খুব সাবধানে না চললে চড়ায় উঠে পড়ার ভয় আছে।

ষ্টীমারের মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গে আমাদের সকলেরই রীতিমত ভাবসাব হ'য়ে গেছে। মেসিন-ঘর থেকে তাদের রান্নাঘর সর্বত্রই আমাদের অবাধ গতিবিধি।

এমন সময়ে ষ্টীমারটা সম্পূর্ণ থেমে গেল। এতক্ষণ মেসিন চলছিল না বটে, কিন্তু স্রোতে ভেসে চলেছিল ষ্টীমারটা অতি মন্থর গতিতে। এইবার ছোট একটা নোঙর নামিয়ে দেওয়া হ'লো।

ধুবড়ি থেকে তখনও আমরা অন্তত পক্ষে তিন চার মাইল দূরে।

ব্যাপার কি ? এখানে নোঙর কেন ?

নেমে গেলাম লোয়ার ডেকের সামনের দিকে। সেখানে একজন একটা বাঁশ জলের মধ্যে নামিয়ে দিচ্ছে আর একটানা ব'লে চলেছে, 'এক বাঁও পাই না।'

আর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ ভাই, ষ্টীমার যে একেবারে থেমে গেল। এখন যাবে না?

দূরে একটা জেলে ডিঙ্গি দেখিয়ে সে বললে, ওই আড়কাঠি আসছে। ও এলে তবে ষ্টীমার চলবে।

আড়কাঠি বস্তুটিকে পরে বুঝলাম। বেচারা গ্রামাঞ্চলের মানুষ ব'লে বলা হয় আড়কাঠি। কলকাতার পোর্ট কমিশনারের লোক হ'লে ওকেই বলা হ'তো পাইলট। ওরা নৌকা ক'রে ঘুরে ঘুরে স্রোতের খাত বুঝে বুঝে বাঁশের কাঠি পুঁতে রাখে। সে রকম জায়গায় ওরাই এসে ওই বাঁশের কাঠির নিশানা ধ'রে ষ্টীমারকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। সারেঙ এসব জায়গায় অসহায়।

হায় কপাল। যে লোকটি ওই জেলে ডিঙ্গি থেকে ষ্টীমারে উঠে এলো, তাকে দেখেই তো আমরা থ'। আমরা সভ্য দুনিয়ার মানুষ। নাম, খেতাব আর পোষাক দেখে মানুষের দর ঠিক করি, তার কাজের গুরুত্ব যাচাই করি।

আট-হাতি একটা ধুতি পরা, আর প্রকৃতই হাঁড়ি থেকে বার ক'রে আনা একটি হাফ সার্ট গায়ে আড়কাঠি মশাই চ'লে গেলেন একেবারে সারেঙ সাহেবের ঘরে।

আমরা মনের মধ্যে কোন আস্থা না পেলে কি হবে! আড়কাঠি মশাই ষ্টীমারের হাল ধরলেন। নোঙর উঠলো। সেই মাল্লাটি তার বিচিত্র নাকি-সুরে কখন যেন বলতে সুরু করেছে, 'এক বাঁও পাই, দু'বাঁও পাই না।'

ধুবড়িতে নেমে আর, টি, ও'র দপ্তরে রিপোর্ট করলাম।

আর, টি, ও অর্থে রেলওয়ে ট্রান্সপোর্টেসন্ অফিসার। সেনাবাহিনীকে রেল ভ্রমণের ব্যাপারে উক্ত আপিস সাহায্য ক'রে

থাকেন। কিন্তু রেল ভ্রমণের ব্যাপারে যারা একবারের জন্যেও ওঁদের শরণাপন্ন হয়েছে, তারা ওঁদের নামের আদ্যাক্ষর বজায় রেখেই নতুন ভাবে নামকরণ করেছে—রিয়ালি ট্রাবল্‌সম্‌ অফিসার।

এ কথা জানা সত্ত্বেও এ হেন আর, টি, ও'র কাছে ধর্ণা দেওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না। একে তো চলেছি মিলিটারী ডিউটিতে, তার ওপর গলায় ঝুলছে দুই আধমণি প্যাকিং বাক্স—যার মধ্যে আছে একশো উনপঞ্চাশ কোম্পানির প্রাণ-ভ্রমর।

আর, টি, ও লেফটেনান্ট তার স্বভাবসিদ্ধ উদাসীন স্বরে বললেন, আমি আজকেই তোমায় ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু শিয়ালদহের আর, টি, ও'তো তোমাকে ছাড়বে না। কলকাতায় এখন ভীষণ হাঙ্গামা চলেছে। হয় তো তোমাদের দু'চার দিনের জন্যে কলকাতার উপদ্রুত অঞ্চলে রাইফেল নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতে হ'তে পারে।

মুখ আমার শুকিয়ে গেল। কর্তব্য কর্মে বিঘ্ন ঘটলো ব'লে নয়, কলকাতার অবস্থা শুনে।

তখনই ফিরে এলাম ট্রানজিট্‌ ক্যাম্পে। রফিককে বললাম সব কথা।

রফিক বললে, না বোসবাবু, সে পারবো না। আসামের জঙ্গলে জাপানীদের সঙ্গে লড়তে পারবো। কিন্তু কলকাতায় লড়াই করবো কার সঙ্গে?

আর উচ্চবাচ্য করলাম না। কলকাতার কথা ভেবে যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

হাবিলদার মেজর হরিকিষণকেও বললাম।

হরিকিষণ বললে, আরে ইয়ার, চুপচাপ ব'সে থাকো না। চলো

ধুবড়ি শহর সফর ক'রে আসি। যখন এরা নিজেরা ডেকে যেতে বলবে, তখন আমরা যাবো। আমাদের অত গরজ কিসের!

এইটাই ছিল ভারতীয় সৈনিকদের মর্মকথা। বৃটিশের রাজত্ব রক্ষার জন্যে তারা মিলিটারীতে ভর্তি হয়নি। তারা ঢুকেছিল চাকরী করতে। তাই তাদের মনোভাব ছিল দিনগত পাপক্ষয় ক'রে মাস গেলে মাইনেটা বুঝে নেওয়া।

অবশ্য অফিসারদের ক্ষেত্রে একটু স্বাতন্ত্র আছে। বৃটীশ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা সবক্ষেত্রে সমান নয়। এদের মধ্যে প্রধানত ছিল পদ আর অর্থের প্রতি লোভ। উচ্চপদে ভালো মাইনেয় ভর্তি হ'য়ে বুকভরা উচ্চাশা এরা পোষণ করতো। অফিসারকুলে যারা অন্তর্ভুক্ত হ'তো, তারা পেটের দায়ে এখানে আসতো না, তারা আসতো ভাগ্যের সন্ধানে। তাই এই অফিসারদের ক্ষেত্রেই দেখা যেতো 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়' কথাটার যথার্থতা। উন্নতির সোপান বেয়ে ওপরে উঠতে গেলে, এখানকার সিঁড়ি হ'লো সৈনিকদের কাঁধ। সেই কাঁধের ওপর পায়ের ভর রেখে এগিয়ে যাওয়ার কৌশলটার নাম এফিসিয়েন্সি।

বিকেল বেলায় ধুবড়ি শহর ঘুরে এলাম। প্রায় বাঙলা দেশেরই একটি মফঃস্বল শহর ব'লে মনে হ'লো। ঘুরে ঘুরে রীতিমত ক্লান্ত হ'য়ে ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরলাম। হোটেলেই খেয়ে নিয়েছিলাম। তাই শোয়ার চিন্তাটাই তখন মাথায় ছিল।

তাঁবুর মধ্যে ঢুকে দেখি, নতুন একটা দল তাঁবুটাকে প্রায় ভ'রে ফেলেছে। খবর নিয়ে জানতে পারলাম, তারা আজকের রাতটা এই ক্যাম্পে থাকবে। আগামী কাল সকালেই রওনা হ'য়ে যাবে তাদের গন্তব্যস্থলে।

কোথায় তাদের গন্তব্যস্থল, এ প্রশ্ন করা একজন সৈনিকের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। মিলিটারী সিকিউরিটির রীতি অনুসারে

এমন প্রশ্নকারীকে অনায়াসে শত্রুপক্ষের গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। কাজেই, ওই প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে, কোথা থেকে আসছে, সেই কথাটা কি ভাবে জানা যায়, তারই একটা কৌশল ঠিক করছিলাম। তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে কোন কৌতূহলই আমার নেই। আমার উৎকণ্ঠা কলকাতা সম্বন্ধে। ওরা যদি কলকাতা দিয়ে এসে থাকে, তাহ'লে সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে একটা আভাষ অন্তত দিতে পারবে।

হাবিলদার মেজর হরিকিষণকে বললাম, বুঝলেন হাবিলদার মেজর সাহেব, কাল আমি আর, টি, ও'কে বলবো, কলকাতা দিয়ে পাঠাতে যদি এতোই অসুবিধা থাকে, তাহ'লে আমাদের কাটিহার দিয়ে পাঠিয়ে দিক। কলকাতায় গণ্ডগোল ব'লে শুধু শুধু আমাদের এখানে আটকে রাখার কোন মানে হয় না।

নবাগতদের মধ্যে থেকে একজন বললে, কলকাতার গণ্ডগোল অনেক দিন থেমে গেছে। এখন অবস্থা একেবারেই নরম্যাল্।

পরে তার কাছে জানা গেল, তারা কলকাতা হ'য়েই আসছে। সেখানকার অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তারা দু'দিন কলকাতায় ছিল এবং অবাধে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়িয়েছে।

এমন খবরে খুশী হওয়ারই কথা। ট্রানজিট ক্যাম্পের এই নিষ্কর্মা জীবন থেকে ছাড়া পাবার পথ হ'লো। কিন্তু মনটা দ'মে গেল। মনে হ'লো কলকাতা যেন হেরে গেল!

রাতটুকু কাটবার যা অপেক্ষা। সকালে উঠেই আবার গিয়ে হাজির হ'লাম আর, টি, ও'র আপিসে। সেই একই লেফটেনান্ট গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমার সমস্ত কাগজপত্র দেখলে। পরম ধৈর্যের সঙ্গে আমার কর্তব্যের গুরুত্বের কথা শুনলে। তারপর আধা-ভৎ'সনার সুরে বললে, তুমি কালই চ'লে যাওনি কেন?

প্রশ্নটায় একটু ভড়কে গিয়েছিলাম। কোথায় তৈরী হ'য়ে

এসেছিলাম, সাহেবের সঙ্গে এক পক্কড় ল'ড়ে যাবো। প্রথমে বলবো কলকাতার শান্ত অবস্থার কথা। তাতে যদি কাজ না হয়, দাবি করবো, আমাকে কাটিহার দিয়ে পাঠানো হোক্।

একটু পরে যেন দিব্যজ্ঞান লাভ করলাম। সাহেবের প্রশান্ত মুখাবয়ব থেকেই সত্যের সেই জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। কাল যিনি আমাকে কলকাতায় রাইফেল ঘাড়ে ক'রে রাস্তায় রাস্তায় টহল দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ছিলেন, তিনি তো এই মানুষটি ন'ন। তিনি ছিলেন এই মানুষটির উদরস্থ হুইস্কির বোতলটি।

সে যাই হোক, লেফটেনান্ট সাহেব আমাদের জন্যে রীতিমত সুবন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। ধুবড়ি থেকে পার্বতিপুর একটি থুরু বগি জুড়ে দিলেন গোলোকগঞ্জগামী ট্রেনে, আর সেই বগিতে আমাদের জন্যে দুটো বেঞ্চি রিজার্ভ ক'রে দিলেন।

ফিরে এসে ছুটোছুটি দৌড়ঝাঁপ ক'রে হাবিলদার মেজর হরিকিষণকে খুঁজে বার করলাম। বললাম, এখনই যান সাহেবের কাছে। মেজাজ এখনও ভালো আছে।

হাবিলদার মেজর সাহেব তখনই ছুটে গেলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রচণ্ড হাসতে হাসতে ফিরে এলেন। বললেন, ভুল হ'য়ে গেছে বোস। তোমার সঙ্গে গেলে আমিও আজই ছাড়া পেয়ে যেতাম। গিয়ে দেখি, সাহেব ইতিমধ্যে বোতল কয়েক বীয়ার শেষ ক'রে ফেলেছে। কাজেই খানিকটা ধমক খেয়ে ফিরে আসতে হ'লো।

আমরা দলছাড়া হ'য়ে গেলাম। বহিবিশ্বে একই কোম্পানির আমরা পাঁচজন যেন ছিলাম একই পরিবারভুক্ত। বিচিত্র সেই পরিবার। একজন হাবিলদার মেজর, একজন হাবিলদার ক্লার্ক আর তিনজন সিপাই। একজন লাহোরের লোক, একজন কলকাতার মানুষ, আর তিনজনের মধ্যে একজন হাওড়ার গাড়োয়ান, আর দু'জন হয়তো

পাঞ্জাবের কৃষক। কোথাও মিল নেই এই মানুষ ক'টার মধ্যে। অমিল তাদের জাতিতে, ভাষায়, আচারে, ব্যবহারে। তবুও দলছাড়া হওয়ার প্রাক্কালে তাদেরই জন্যে বিচ্ছেদ ব্যথা অনুভব করলাম।

আমি আর রফিক আমাদের সেই প্যাকিং বাক্স দুটি নিয়ে ধুবড়ি ষ্টেশনে সেই বিশেষ বগিটিতে উঠলাম।

উপস্থিত পার্বতিপুর পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। কেমন যেন সমস্ত শরীর আর মন দিয়ে নিশ্চিন্ততা বোধ করলাম।

রফিককে বললাম, বেশ লাগছে, না রফিক।

রফিক বললে, তা মন্দ লাগছে না বোসবাবু। তবে কলকাতায় গিয়ে একটা দিনের জন্যে বাড়ী যাবো।

রফিকের মন প'ড়ে আছে বাড়ীর দিকে। সেখানে তার বো আছে, আর আছে বুড়ো মা।

আমারও মন প'ড়ে রয়েছে বাড়ীর দিকে। ছোট বোন দুটো বড় কেঁদেছিল, আমার মিলিটারীতে ভর্তি হওয়ার কথা শুনে। বাবা কেমন এক আকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। মায়ের দৃষ্টিটাও যেন তারই চোখের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাই।

ট্রেণ চললেই আমার ভালো লাগে।

ধুবড়ি থেকে ট্রেণ ছাড়লো। কতো মাঠ, প্রান্তর, বন-জঙ্গল পার হ'য়ে আমরা চললাম। বঙ্গাইগাঁও যাওয়ার পথে ট্রেণ চলেছে টিপকাই ফরেস্টের পাশ ঘেঁষে। ছেলেমানুষের মতোই মনে হয়েছিল, সেই দুটো খড়্গাওয়ালা গণ্ডারটাকে যদি দেখতে পাই!

গোলোকগঞ্জে এলাম বিকেল নাগাদ। সময় অনেকক্ষণ পাওয়া গেল। আমরা নিশ্চিন্ত, আমাদের বগিটাকে যথাসময়ে মেইন লাইনের থ্রু ট্রেণের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। সুতরাং অন্য ভাবনায় মন দিলাম।

কেমন যেন ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছিল। রফিককে বললাম সে কথা।

রফিক তো সর্বদাই এক পায়ে খাড়া !

কিন্তু সমস্যাও ছিল। ওই দুই প্যাকিং বাক্স। দু'জনে মাল ছেড়ে এক সঙ্গে যাওয়া যায় না। জানি, ও মাল কারও হাতে তুলে দিলেও সে নেবে না। কিন্তু আমাদের সব সময়ে মনে রাখতে হবে, শত্রুর চর আমাদের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছে। একটু অন্যমনস্ক হয়েছি কি ওই বাক্স দুটি তারা তুলে নিয়ে একেবারে জাপানীদের কাছে পৌঁছে দেবে। জাপানী শত্রুপক্ষ একশো উনপঞ্চাশ কোম্পানির নাড়ি নক্ষত্র জেনে ফেলবে। তারই ফলে ভারত জয় করা তাদের কাছে ছেলেখেলার সামিল হ'য়ে দাঁড়াবে।

অগত্যা রফিক নিয়ে এলো রুটী আর মাংস। বললে, আপনি খেয়ে নিন। আমি পরে খাব'খন।

ওর মধ্যে কেমন যেন একটা 'মা-মা' ভাব। সব সময়ে সমস্ত মনটা দিয়ে আমাকে আগলে রয়েছে। কখন খেতে হবে মনে করিয়ে দিচ্ছে। কখন শুতে হবে তাও ব'লে দিচ্ছে।

রফিকের সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে এক সঙ্গেই খেলাম। রফিককে খুশী করার জন্যে নয়। নিজে খুশী হ'লাম। আমাকে 'বাবু' বা 'সাহেব' বানিয়ে দিয়ে রফিক যেন আমার অপরিচিত থেকে না যায়। দেখলাম, সামান্য এই সংস্কারটুকু কাটিয়ে ওঠার জন্যে, দূরত্ব আর ব্যবধান তখনও যেটুকু ছিল, সেটুকু যেন ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল ।

গোলোকগঞ্জ ছেড়ে লালমনিরহাট হ'য়ে পার্বতীপুরে পৌঁছলাম বেশ রাত্তিরে। যে প্ল্যাটফরমে এসে আমাদের ট্রেণটা দাঁড়িয়েছে, তারই উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাউন দার্জিলিং মেল।

রফিককে বললাম, আর কোন কথা নয় রফিক, মোট ঘাট নিয়ে এই ট্রেনটায় উঠে পড়তেই হবে। ভোর বেলায় কলকাতায় পৌঁছানো যাবে।

তিল ধারণের স্থান নেই অভিজাত ট্রেণ দার্জিলিং মেলের সামান্য

কয়েকখানা থার্ড ক্লাসে। দুটো মানুষ ওঠাই প্রায় অসম্ভব। তদুপরি আবার দুই জবরজং প্যাকিং বাক্স।

আমি তো হতাশ হ'য়ে পড়লাম! দাঁড়িয়ে রইলাম ব্ল্যাক-আউট-সেড্ লাগানো একটা আলোর তলায় ওই দুই প্যাকিং বাক্স সামনে নিয়ে। মনে মনে প্রমাদ গুণছি, তাহ'লে বুঝ প'ড়ে থাকতে হ'লো পার্বতিপুর স্টেশনে সারা রাতের জন্যে।

হঠাৎ রফিক একটা প্যাকিং বাক্স ঘাড়ে তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরার দিকে। এক আর, টি, ও সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে সেই কামরার সামনে। রফিক তাকে ঠেলেঠুলে দরজার মধ্যে ঢুকতে যায়।

আর, টি, ও সার্জেন্ট ঠিক ব্যাপারটা হয়তো আন্দাজ করতে পারেনি। রফিককে বললে, উধর্ নহি, ইধর্ আও।

পাশের কামরার দরজাটা সার্জেন্ট সাহেবই খুলে দিলে।

রফিক সোজা ভেতরে ঢুকে গিয়ে প্যাকিং বাক্সটা একটা ধারে রেখে এক লাফে বেরিয়ে এসে বললে, ওর থোড়া ঠাহ্‌র্ যাইয়ে সার্জেন্ট সাহেব, ঔরভি একঠো বাকস্ হ্যায়। বহুৎ জরুরী চাজ্ব।

লাফাতে লাফাতে আমার কাছে এসে বাকী বাক্সটা ঘাড়ে তুলে নিয়ে বললে, আপনি যেন ওই বিছানাগুলো ঘাড়ে ক'রে যাবেন না। ব্যাটা সার্জেন্ট ধোঁকা খেয়ে গেছে। ভাবছে বুঝি কোন সাহেবের মালপত্তর ওঠাচ্ছি। এটা রেখে ফিরে এসে আমি ওই বিছানা দুটো ঘাড়ে ক'রে যাবো, আর আপনি আসবেন আমার পেছনে পেছনে সাহেবের মতো। আসল মাল যখন তুলে দিয়েছি, তখন আর আমাদের ঠেকাতে পারবে না, কি বলেন!

বলবার ইচ্ছে ছিল কয়েকটা কথা, কিন্তু সে অবসর রফিক তো আমাকে দিলে না। প্ল্যান সে নিজেই করেছে, আর সেই অনুযায়ী কাজ হাসিল খানিকটা তো করেছে। এখন শেষ রক্ষাই হ'লেই হয়।

রফিক তার অংশটুকু সরল ভাবেই সম্পাদন করলো। মাল নিয়ে কোন গণ্ডগোল হ'লো না। কিন্তু বিপদ বাধলো আমাদের নিয়ে। আমরা যে মানুষ!

সর্বশেষ আমি যখন রফিকের পেছন পেছন কামরায় উঠতে যাচ্ছি, সার্জেন্ট সাহেব ঠিকই বাধা দিলেন আমাদের। বললেন, ইউ কাণ্ট গো ইন্ দিস্ কম্পার্টমেণ্ট।

সাহেবি ভাষায় আমি সাহেবসুলভ ক্রোধ দিয়ে বললাম, আই হ্যাভ্ টু গো।

আমার কাগজপত্তর দেখালাম। কর্তব্যের গুরুত্ব বোঝালাম। বললাম, আই এ্যাম্ গোয়িং অন্ আর্জেন্ট ডিউটি। ইফ্ আই মিস্ দিস্ ট্রেণ, আই স্যাল্ বি লেট্ ফর্ ওয়ান ডে।

রাজভাষা আমার মুখে শুনে রাজার জাতের সার্জেন্ট সাহেবের হৃদয়টা হয়তো বা একটু দ্রব হয়েছিল। কিন্তু আমার রেলওয়ে ওয়ারাণ্ট যে থার্ড ক্লাসের। সেইখানেই সার্জেণ্ট সাহেবের অসুবিধা হচ্ছে সবচেয়ে বেশী।

কামরার সব ক'টা বার্থ ভর্তি। বসবার জায়গা হ'তে পারে, যদি কেউ আমাদের জন্য সারারাত ব'সে থাকতে পারেন। কামরার আরোহী সকলেই অফিসার—ক্যাপটেন, মেজর, লেফটেনাণ্ট কর্ণেল, হয়তো এক-আধ জন কর্ণেল বা ব্রিগেডিয়ার থাকলেও থাকতে পারেন। এঁদের মধ্যে কার কাছেই বা এমনতর প্রস্তাব করা যেতে পারে। আর সে প্রস্তাব করবেই বা কে!

অন্যদিকে সার্জেণ্ট সাহেবের বিপদ, আমাদের দুই প্যাকিং বাক্স তখন কামরার মধ্যে। এদিকে ষ্টার্টার সিগন্যাল্ দেওয়া হ'য়ে গেছে। গার্ড সাহেব তাঁর থাণ্ডার হুইসিলে সমস্ত প্ল্যাটফরমটা কাঁপিয়ে তুলেছেন।

শেষ সর্ত সার্জেণ্ট সাহেব আমাদের কাছে দাখিল করলেন, আমরা কোন বার্থ পাবো না।

সানন্দে আমরা রাজী হ'লাম। বার্থ আমাদের চাই না। আমরা ওই প্যাকিং বাক্সের ওপর ব'সেই যাবো।

' সার্জেণ্ট সাহেব অত্যন্ত বিনীতভাবে জানলার ধারে ব'সে-থাকা আরোহিটীর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা নিবেদন করলেন।

র‍্যাঙ্ক-না-জানা অফিসারটি পাইপ-চেপে-ধরা দাঁতের ফাঁক দিয়ে 'গ্যাঁও' জাতীয় একটা শব্দ করলেন।

তাতেই আশ্বস্ত হ'য়ে সার্জেণ্ট সাহেব দরজা ছেড়ে নেমে পড়লেন।

আমরা উঠে পড়লাম।

ট্রেণ ছেড়ে দিলো।

সারারাত সেই কাঠের বাক্সের ওপর জড় পদার্থের মতো ব'সে রইলাম। বাকী সকলে প্রশস্ত বার্থগুলোর ওপর দেহ মেলে দিয়ে প্রশান্ত ঘুমের কোলে ঢ'লে পড়লেন। একজন আবার মাথার কাছের স্তিমিত আলোয় বই পড়লেন অনেক রাত পর্যন্ত।

ভয়ে জড়সড় হ'য়ে আমরা দু'জন ব'সে রইলাম। একজনের ঘুম এলে অপর জন তাকে জাগিয়ে দিই। আমরা আতঙ্কিত, যদি ঘুমের ঘোরে আমাদের নাক ডেকে ওঠে!

বিড়ির ধোঁয়ার জন্যে মনটা যখন আকুলিবিকুলি ক'রে ওঠে, তখনও সাহস ক'রে একটা বিড়ি ধরাতে পারি না। বিড়ির বটু গন্ধে যদি ওই অভিজাত অফিসার সাহেবদের ঘুম ভেঙে যায়, তাহ'লে ওদের মধ্যে থেকে যে কোন একজন উঠে এসে কামরার জানলা দিয়ে অনায়াসে আমাদের যে কোন একজনকে বা উভয়কেই বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। ওরা যে রাজার জাত!

দার্জিলিং মেল ছুটে চলেছে উর্ধ্বশ্বাসে।

পূর্ব বঙ্গ রেলপথের নাম পরিবর্তিত হ'য়ে তখন হয়েছে বাঙলা ও আসাম রেলপথ। কোম্পানির কর্তৃত্ব শেষ হ'য়ে তখন রাষ্ট্রায়ত্তাধীন। দার্জিলিং মেল ওই রেলপথের সবচেয়ে অভিজাত

ট্রেণ। লম্বা লম্বা তার রান প্রচণ্ড তার গতি। ভোর না হ'তেই শিয়ালদহে পেঁাছে যাবে।

এইটুকুই যা ভরসা।

শিয়ালদহে পৌঁছে প্রথম সমস্যা দাঁড়ালো আর. টি, ও'র চোখকে ফাঁকি দেওয়া।

ধুবড়ির অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, এই রিয়াল্লি ট্রাবল্‌সাম্ অফিসারদের সঙ্গে 'শত হস্তেন' নীতিটাই প্রাজ্ঞজনোচিত।

রফিক্ সে ব্যবস্থা ঝটপট ক'রে ফেললে। দুটি কুলির মাথায় সমস্ত মালপত্তর তুলে দিয়ে সে নিজে গেল এগিয়ে। আমি রইলাম পেছনে। কুলিরা মাঝখানে। এই তিন সারির মধ্যে অন্তত হাত দশেক ক'রে ফাঁক। এই ফঁাকের জোরেই আমরা আর, টি, ও'কে ফঁাকি দিতে চাই। ভাবখানা আমাদের যেন এই তিন সারির মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই। আমরা সকলেই একক।

যখন মাল সমেত ট্যাক্সিতে উঠি, তখন চোরের মতোই একবার পেছন পানে ফিরে তাকালাম, তখনও যদি কোন আর, টি, ও আমাদের আশেপাশে থেকে থাকে। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেওয়ার পর বুঝতে পারি, একটু বেশী ভয় পেয়েছিলাম আমরা। আর, টি, ও হ'লেও চাকুরী-জীবি। কাজেই আমাদের মতো নগণ্য সিপাইদের নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর কোথায় তাদের! বিশেষ ক'রে কয়েক ডজন অফিসার যখন নেমেছে ওই ট্রেণ থেকেই।

আমি গেলাম ভবানীপুরে, মামার বাড়ী।

রফিক গেল তার নিজের বাড়ী টিকিয়াপাড়ায়।

স্থির হ'লো, বেলা তিনটের সময়ে হাওড়া ষ্টেশনের আর, টি, ও'র সঙ্গে দেখা করা। আমরা নিজে থেকে আজই রওনা হওয়ার জন্যে

কোন চেষ্টা করবো না—এ প্রতিশ্রুতি রফিকের কাছে আমাকে দিতে হ'লো।

হাওড়া স্টেশনে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় আমরা আবার একত্র হলাম।

রফিক সিভিলিয়ান পোষাক প'রে এসেছে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। আমার সে উপায় নেই। আর. টি. ও'র সঙ্গে দেখা ক'রে কথাবার্তা বলতে হবে আমাকেই। আমি যে র‍্যাঙ্কে হাবিলদার।

এক সার্জেন্ট আমাদের কাগজপত্র দেখে ব'লে উঠলো, জলন্ধর! জলন্ধর যাওয়া এখন চলতেই পারে না। মেইন্ লাইন এবং গ্র্যাণ্ড কর্ড, দুটো লাইনই বন্ধ।

কথাটা শুনে প্রথমটা পুলকিত হয়েছিলাম। তারপর ঘনিয়ে আসতে লাগলো বিস্ময়।

এও কি সম্ভব!

লাইন বন্ধ কেন, সে প্রশ্ন আর করিনি। এই কয়েক ঘণ্টা কলকাতায় থাকার মধ্যে যেটুকু শুনেছি, লাইন বন্ধের কারণ বোঝার পক্ষে সেই তথ্যটুকুই যথেষ্ট।

কিন্তু আমার বিস্মিত প্রশ্ন বারে বারে আমারই কাছে ফিরে আসতে থাকে, একি সত্যিই সম্ভব! যখন বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ তার সমস্ত শক্তির সমাবেশ করেছে এই ভারতবর্ষে, যখন বৃটীশ সিংহ দুর্দ্ধর্ষ ফ্যাসিবাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চলেছে পৃথিবীব্যাপি তার উপনিবেশ রক্ষার তাগিদে—তখন কিনা অর্ধোলঙ্গ, আধপেটা খাওয়া, অশিক্ষিত এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ভারতবাসী একটা যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বানচাল ক'রে দিয়েছে!

বৃটীশের এতো শক্তি আর এতো দম্ভ গেল কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় আর এক বিস্ময়। এই অমিত শক্তিই বা ভারতবাসী পেলে কোথা থেকে! উনিশশো একুশ থেকে উনিশশো

বিয়াল্লিশ—এই বিশ বছর ধ'রে যে দেশের জাতীয় আন্দোলনের মূলমন্ত্র হ'লো নন্‌ভায়োলেন্স আর নন্‌কোঅপারেশন—সেই জাতির মধ্যে এই বিরাট বিপ্লবী শক্তি লুকিয়ে ছিল কোথায়! এক দিকে অহিংস সত্যাগ্রহ, অপর দিকে ভাইসরয়ের দরজায় ধর্ণা—এই যখন জাতীয় আন্দোলনের নীতি এবং কৌশল, তখন কোথা থেকে জেগে ওঠে এই দুর্বার শক্তি!

আর, টি, ও আপিসের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিলাম। চোখের ওপর ভেসে উঠছিল ভারতের এক নবতর রূপ।

রফিক কানের গোড়ায় মুখ এনে বললে, তাহ'লে কি হবে বোসবাবু?

চমকে উঠলাম রফিকের কথায়।

কি হবে সে তো ইতিমধ্যেই জানা গেছে। তারই লক্ষণ তো সেই আসাম থেকে দেখতে দেখতে আসছি। আসাম, মিলিটারী ক্যাম্পে দু'চারটে ঢিল মেরে, আগুন লাগাবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে, জনকয়েক সৈনিককে পথেঘাটে নিগৃহীত ক'রে বিপ্লবের পালা শেষ করেছে। কলকাতায় দেখলাম নিয়ম ও শৃঙ্খলার রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। আর বিহার, না হয় শান্ত হ'য়ে যাবে বড় জোর আর এক মাসে!

সার্জেন্ট সাহেবকে প্রশ্ন করলাম, কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

যে উত্তর আশা করেছিলাম, সেই উত্তরই পেলাম।

সার্জেন্ট সাহেব কি যেন ভেবে নিয়ে বললে, এক সপ্তাহ পরে এসে একবার খোঁজ নিও।

অর্থাৎ রাজপুরুষেরা আশা করছেন, আর এক সপ্তাহের মধ্যে সব শান্ত হ'য়ে যাবে! সবই আবার ঠিক আগের মতোই চলবে।

সুতরাং এ মিলিটারী উর্দির কলঙ্ক এ যাত্রায়ও ঘুচলো না। আমি এবং আমরা, যারা মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছি, তারা দেশদ্রোহী হ'য়ে

গেলাম এবং সেই আখ্যাই হয়তো চিরদিনের জন্য বহন ক'রে চলতে রইলাম। কারণ, আমাদের হাত দিয়ে বৃটিশ সরকার গুলি ছুড়িয়েছে বিপ্লবীদের ওপর। আমাদের দিয়েই আবার রেল চালু করেছে, লাইন পাতিয়েছে।

সুবর্ণ সুযোগ! ব্যর্থ এই বিপ্লবের কালি আমাদের মুখে মাখিয়ে দিয়ে, বিপ্লবের নেতারা তাঁদের হাত সাফ্ ক'রে ফেললেন। কেবল সরলপ্রাণ কিছু কৃষক; কিছু শ্রমিক আর কিছু মধ্যবিত্ত যুবক তাদের অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিসর্জন দিলে ভাবাবেগের মাশুল স্বরূপ!

আমার আর রফিকের অবস্থাটা এসে দাঁড়ালো ত্রিশঙ্কুর পর্যায়ে। না পারি ফিরে যেতে আসামে আমাদের কোম্পানিতে, আবার কলকাতায় যে এক সপ্তাহ ব'সে থাকবো তারও উপায় নেই। কোম্পানির কেউই বিশ্বাস করবে না যে, আমরা সত্যি সত্যিই আটক প'ড়ে গিয়েছিলাম।

বিশ্বাস আমাদের মিলিটারী কর্তৃপক্ষও করে না। তারা জানে যুদ্ধ ক'রে প্রাণ দেওয়ার জন্যে আমরা মিলিটারীতে ঢুকিনি। আমাদের কর্মজীবন দিনগত পাপক্ষয়ের ছাঁচে ঢালা।

এ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ মায়াবাদী। আমার মাতৃভূমি আমার দেশ নয়! ওতো বৃটিশের রাজত্ব। তাই আমরা স্বদেশ সম্বন্ধেও নিস্পৃহ। যুদ্ধে যোগ দিয়েও, যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ নির্বিকার। কারণ, জয়-পরাজয় যে পক্ষেরই হোক, আমাদের জীবনে যে কোন পরিবর্তন আসবে না, সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ।

অগত্যা আর, টি, ও'কে বললাম, তাহ'লে সে কথা তুমি লিখে দাও আমাদের মুভ্‌মেন্ট অর্ডারের ওপর।

আর, টি, ও সার্জেণ্ট যদিও একজন সাহেব, অর্থাৎ ইংরেজ, তবুও তার চরিত্রে এরই মধ্যে যে বেশ খানিকটা ভারতীয়ত্ব এসে গেছে, সেটুকু বুঝলাম, লেখার কথায় তার নাক কুঁচকে ওঠাতে।

সার্জেণ্ট সাহেব আমাদের কাগজপত্র নিয়ে চ'লে গেল তার ওপরওয়ালার কাছে। যদি কিছু লিখেই দিতে হয়, তাহ'লে বড় সাহেবই লিখুক।

কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে সার্জেণ্ট সাহেব বললে, তোমরা কালই যেতে পারো। তবে তোমাদের যেতে হবে ভায়া নাগপুর।

সম্ভবত আর্তনাদ ক'রে উঠেছিলাম, ভায়া নাগপুর!

সার্জেণ্ট বললে, ইয়েস্, দ্যাট ইজ দি ওনলি রুট নাউ ওপেন্। তোমরা বম্বে মেল্'এ যাবে নাগপুর। নাগপুর থেকে ইটারসি। ইটারসি থেকে দিল্লী। দিল্লী থেকে জলন্ধর। দি জার্নি ইজ ভেরী সিম্পল্।

সিম্পল্ যে সে তো সাহেবের কথায়ই বোঝা গেল। রুটটা বাতলাতে সাহেবের বড় জোর লেগেছে এক মিনিট। তবে আর জটিলতা কোথায়!

আমাদের তো চলতি কথাই আছে, 'ঢেঁস্কেল্ ঘুরে কটক'। ঢেঁস্কেল স্থানটি যে কোথায়, তা আমার জানা নেই। আর সেই ঢেঁস্কেল ঘুরে কটক যেতে কতোটা ঘুর-পথে যেতে হয়, তাও জানি না।

কিন্তু হাওড়া থেকে জলন্ধর ভায়া নাগপুর—পথটা আমার বোধগম্যের মধ্যে। ভ্রমণটা যে বেশ কৌতুকপ্রদ হবে, সেটা যেন উপলব্ধি করতে পারলাম।

আনুগত্যের কার্পণ্য করিনি। পরদিনই রওনা হলাম।

রফিক আমার ব্যস্ততায় একটু যেন ক্ষুব্ধ হ'লো। আরও দু'একটা দিন কলকাতায় থেকে যাওয়ার ইচ্ছেটা তার প্রবল। যুক্তিও তার ছিল, কয়েকটা দিন অপেক্ষা করলেই তো সোজা রাস্তায়

যাওয়া যেতো। যে সময়টা ট্রেণে ট্রেণে ঘুরবো, সে সময়টা বাড়ীতে থাকতে পারতাম।

মিলিটারী আইনকানুনের নির্মমতার কথা রফিককে বুঝাবার চেষ্টা করলাম। আমাদের উভয় সঙ্কটের কথা ব্যাখ্যা করলাম। এতো বুদ্ধির কসরত রফিক বুঝলো না। শুধুই আমার কথা ব'লে মুখ বুজে মেনে নিলে।

বোম্বে মেল্'এ রওনা হ'লাম।

নিশ্চিন্ত মনে বিস্তারা বিছিয়ে গোছগাছ ক'রে বসেছি। নাগপুর পর্যন্ত তো কোন দুর্ভাবনা নেই। আর সত্যিই ভাবনা উদ্রেকের মতো কোন ঘটনা ঘটেনি ওই পথটুকুতে। কেবল টাটানগরে প্রচণ্ড এক ভীড় এসে গাড়ীটাকে ছেঁকে ধরেছিল। জানলা গ'লে যাত্রীরা কামরার মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। কয়েক মিনিটের মধ্যে কামরাটা ঠাসাঠাসি হ'য়ে গেল।

আমরা বসেছিলাম একটা কোণ নিয়ে। বসবার জায়গা যেটুকু দখল করেছিলাম, তা প্রায় চারজনের মতন হবে। এতক্ষণ কেউ আমাদের কাছে বসবার জায়গা দাবি করেনি। আমাদের আরামকেও সঙ্কুচিত করতে হয়নি। হয়তো আমরা মিলিটারী পোষাকে ছিলাম ব'লে আমাদের সঙ্গটাই যথাসম্ভব পরিহার ক'রে চলেছে।

কিন্তু নতুন এই যে ভীড়টা উঠলো, তারা মিলিটারী পোষাকের পরোয়া করলো না। আমাদের দিকে এগিয়ে এলো বসবার মতো জায়গা আছে দেখে।

রফিক রুখে দাঁড়ালো।

আমাকেই শেষ পর্যন্ত রফিককে সামলাতে হ'লো।

তাদের মুখে শুনলাম, টাটা কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের সমস্ত কর্মচারীকে লম্বা ছুটি দিয়েছেন। সেই সঙ্গে মাইনেও দিয়েছেন অগ্রিম

হিসেবে, আর নির্দেশ দিয়েছেন জামসেদপুর ত্যাগ ক'রে চ'লে যাওয়ার, ছুটির সময়টুকুর জন্যে।

অর্থাৎ টাটা কোম্পানিও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। যুদ্ধের ব্যাপারে বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা কোটিপতিরাও করছে না!

হঠাৎই প্রশ্নটা মনের মধ্যে উঁকি মেরে ওঠে, তবে কেন আগষ্ট আন্দোলন ঝিমিয়ে যাচ্ছে!

পরদিন দুপুর নাগাদ নাগপুর পৌঁছলাম। খবর নিয়ে জানলাম, ইটারসির ট্রেণ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ছাড়বে।

সেই যে দুই জগদ্দল পাথর গলায় ঝুলিয়ে বেরিয়েছি, ও দুটিকে স্কন্ধ থেকে না নামানো পর্যন্ত আর স্বস্তি নেই। ওই প্যাকিং বাক্স দুটির ব্যাপারে কোন গাফিলতি চলবে না। পথে যদি খোয়া যায়, তাহ'লে আমাদের জীবনও অক্ষত থাকবে না। জাপানী চর ব'লে সোজা ফাঁসিতে লটকে দেবে।

নতুন জায়গায় এলেই রফিক একটু ঘুরে-ঘারে আসতে চায়। তাকে বারে বারে বোঝাই, ওই বাক্স দুটির মধ্যে রূপকথার রাজকন্যার মতো আমাদেরও প্রাণ-ভোমরা আছে। কাজেই চোখের আড়াল কিছুতেই করা চলবে না।

তবুও রফিককে মাঝে মাঝে ছেড়ে দিতেই হয়। কিন্তু আমি নড়তে পারি না। ওই মড়া আগলে ব'সে থাকি। ও দুটীর দায়িত্ব যে আমার ওপর। সে দায়িত্ব রফিকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত হওয়ার মতো পদমর্যাদা আমার নয়। হাবিলদার হ'লেও ক্লার্ক আমি।

স্টপেজ বেশীক্ষণ থাকলে রফিক প্ল্যাটফর্মে নেমে পায়চারী করে।

ট্রেণ বদলানোর পালা যখন আসে, তখন সাধারণত অবসরটা হয় দীর্ঘকালের। রফিক ষ্টেশনের বাইরে একটু ঘোরাফেরা ক'রে

আসে। সে যেন কেমন অস্থির হ'য়ে উঠেছে। একদিনের গৃহবাস তাকে যেন মিলিটারী জীবন থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। যখন সে চোখের আড়াল হয়, বুকটা আমার কেমন যেন ধুক্‌পুক্‌ করতে থাকে। যদি সে না ফেরে!

ইটারসিতে পৌঁছলাম রাত দশটায়। শুনলাম, দিল্লীর ট্রেণ নাকি মাঝ-রাত্তিরে।

প্লাটফরমের ওপর খোলা আকাশের তলায় ব'সে রইলাম। ব'সে ব'সে যখন ক্লান্তি লাগে, তখন খানিকটা পায়চারী করি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা খাই আর পনেরো মিনিট অন্তর বিড়ি ধরাই।

তবুও বেশ লাগে। কোন্ অজানা আকাশের তলায় ব'সে আছি। এখানকারও আকাশ বাঙলাদেশের মতো একই রকম নীল। এখানকার আকাশেও লক্ষ লক্ষ তারা ফুটে রয়েছে!

চললাম ইটারসি থেকে দিল্লী।

পথে পড়লো ঝাঁসি, গোয়ালিয়র।

আজকের এই বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যেও মনে পড়লো প্রায় একশো বছর আগেকার আর এক যুদ্ধের কথা। তখন ভারতের মানুষ এতোখানি সভ্য হয়নি। এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তখনও খণ্ড, ছন্ন, বিক্ষিপ্ত। তবুও তারা বৃটিশের শাসন মানতে চায়নি। তাই তারা যুদ্ধ ক'রে স্বাধীনতা অর্জন করতে চেয়েছিল। বীরের মতো লড়াই ক'রে জাতির সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল।

এখন আমরা সুসভ্য। কেতাব প'ড়ে জাতীয়তাবাদ শিখি, স্বদেশপ্রেমিক হই। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী সরকারের হৃদয় পরিবর্তনের আশায় আন্দোলন করি। জেলে গিয়ে প্রাণ-বলিদান দেওয়ার আত্ম-প্রসাদ লাভ করি। লড়াই করার নাম মুখে আনি না, তাতে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে কুলি-কাবাড়ি আর চাষাভুষোর দল। স্বাধীনতা যে ভদ্রভাবে বল, এ্যাক্ট আর এ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমেই পাওয়া যেতে

পারে, এমন সহজ কথা বোঝার মতো বিদ্যেবুদ্ধি যে সাধারণ মানুষের আজও হয়নি! তাই নাকি স্বাধীনতা পেতে দেরী হচ্ছে।

ইটারসি থেকে দিল্লী, আর দিল্লী থেকে জলন্ধর পৌছতে আরও দেড়দিন লেগে গেল। এই যে সহস্রাধিক মাইল নির্বিঘ্নে পার হ'য়ে এলাম, অথচ হাওড়া থেকে সোজা পথে কয়েক শো মাইল পার হ'তে পারলাম না—এর মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার কোনটা?

সেই বিস্ময় নিয়ে জলন্ধর পৌছলাম।

তিন দিন প্রায় একটানা ট্রেণে ট্রেণে কাটলো। প্রায় আঠারোশো মাইল ঘুরে এগারোশো মাইলের গন্তব্যস্থলে পৌছলাম। বার বার মনে হ'তে লাগলো, যে ভারতের একটা অংশে ট্রেণ চলাচলের মতো অতি জরুরী একটা ব্যবস্থা একেবারেই অচল হ'য়ে পড়েছে, সেই ভারতবর্ষেরই বিস্তীর্ণ বুক জুড়ে এই বিরাট অভ্যুত্থানের কোন স্পন্দনই কেন অনুভব করলাম না!

জলন্ধরের কাজ দু'দিনেই শেষ হ'য়ে গেল।

কাজটা এমন কিছু জটিল নয়। কোম্পানির নমিন্যাল্ রোলের সঙ্গে সীট্ রোল্গুলো মিলিয়ে হস্তান্তর করা।

ওখানকার আপিসের লোকেরা খুবই সহানুভূতি সম্পন্ন। বিশেষ ক'রে আমাদের অভিযানের কাহিনী শোনার পর। ওদের মধ্যে একজন তো কৌতুহল দমন করতে না পেরে, আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেসই ক'রে বসলো, বাঙলা মুলুকে নাকি আজাদী কায়েম হ'য়ে গেছে?

এমন প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেওয়ার জন্যে মিথ্যে বলতেও প্রলুব্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু লোভকে পাপ জ্ঞান ক'রে সত্যের অপলাপ করিনি। নেতিবাচক উত্তর মাথা নত ক'রেই দিয়েছিলাম।

দ্বিতীয় দিন কাজ শেষ করতে করতে সন্ধ্যে উত্‌রে গেল। সেদিন আর রওনা হওয়ার সময় নেই। পরদিন পাঞ্জাব মেল্‌'এ রওনা হবো—এইটাই ঠিক হ'লো।

ফিরতি পথের রেলওয়ে ওয়ারান্ট সঙ্গেই ছিল। জলন্ধর হেড্‌ কোয়ার্টারস্‌ থেকে আরও একখানা মুভ্‌মেন্ট অর্ডার দেওয়া হ'লো। আমাদের যাত্রাপথের ইজাজদ্‌নামা আরও মজবুত হ'লো।

পরের দিন সমস্ত বেলাটাই ছুটি। সারাদিন আমি আর রফিক জলন্ধর ক্যানটনমেণ্ট এলেকাটা ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। এ যেন এক বিচিত্র শহর। বিভিন্ন তার পাড়া। পাড়ায় পাড়ায় নানান ধরণের কোম্পানি। দিনে দিনে কোম্পানি তৈরী হচ্ছে! তারপর তারাও একদিন রওনা হ'য়ে যাচ্ছে সমরাঙ্গনের পথে। যে সমরাঙ্গন ভারতের ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে সীমিত নয়। তার ব্যাপ্তি এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা জুড়ে।

যথাসময়ে ষ্টেশনে এলাম।

আমাদের ট্রেন পাঞ্জাব মেল্‌। উঠতে গিয়ে প্রথম চোটে খানিকটা নাজেহাল হ'তে হ'লো। কামরাগুলোর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলাঠেলি ক'রেও খুলতে পারলাম না।

কিন্তু আমরাও দমবার পাত্র নই। সিন্ধবাদ নাবিকের সেই দৈত্য আমাদের ঘাড় থেকে নেমেছে। দুই প্যাকিং বাক্স আমরা যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছি। তারই সাফল্যে মনটা আমাদের মুক্ত পাখির মতো হাল্কা।

রফিক বললে, দাঁড়ান বোসবাবু, কেমন উঠতে না দেয় দেখছি। আমরাও মিলিটারী।

সমস্ত ট্রেণটার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি ক'রে দেখেছি, সবই মিলিটারীতে ভর্তি। মনে হয়েছে, পাঞ্জাবে মিলিটারী ছাড়া বুঝিবা পুরুষ নেই! যে কামরাতেই যাই প্রচণ্ড

বাধা। সত্যিই সেখানে বসবার জায়গা নেই। কিন্তু তার জন্যে যাত্রীরা কেন দরজা আটকে রেখে নতুন যাত্রীকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না—এ ব্যাপারটা দুর্বোধ্য।

রফিকের বিছানা আমি ধরলাম। জানলা গ'লে রফিক ভেতরে গেল। দরজাটা সে ভেতর থেকে আমার জন্যে খুলে দেবে ভেবেছিল। কিন্তু সে পরিকল্পনা কার্যকরী করতে যতখানি সময়ের দরকার, ততখানি সময় আমাদের হাতে ছিল না। অগত্যা জানলা দিয়েই প্রথমে বিছানা দুটো দিলাম, তারপর নিজে উঠলাম।

ভেতরে ঢুকতে পেরেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। হাওড়া পর্যন্ত আর এই গাড়ী থেকে নামতে হবে না। জলন্ধর ক্যান্টন্মেন্ট স্টেশনের আর, টি, ও সেই কথাই বলেছিল।

ট্রেণ ছেড়ে দিলো।

পায়ের গোড়ায় নানান বোঁচকাবুঁচকি। সীটগুলোতেও লোক ভর্তি। গাড়ীটা অন্ধকার। এই অন্ধকার নিস্প্রদীপের মহড়া নয়। পাঞ্জাবের সৈনিকরা চোখের ওপর আলো জ্বলা পছন্দ করে না।

পাঞ্জাব থেকে সবচেয়ে বেশী লোক মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছে। পরিসংখ্যান মতে পাঞ্জাবের বেসামরিক জনসংখ্যা উনিশজন নারী-প্রতি একজন পুরুষে দাঁড়িয়েছিল।

পাঞ্জাব কৃষিপ্রধান দেশ। তার অর্থ এই দাঁড়ায়, পাঞ্জাবের কৃষক সম্প্রদায়ই মিলিটারীতে মানুষের জোগান দিয়েছিল। কৃষকের চেহারা ভারতের সর্বত্রই এক। সেই অর্ধ উলঙ্গ কৃষকসন্তান যখন বুট, পট্টি থেকে স্বরু ক'রে মাথায় 'কুল্লা' বা 'পাগ' লাগিয়ে ছ'গজ কাপড়ের পাগড়ি জড়ালো, তখন তার কৃষক মনোবৃত্তি স্বাভাবিক ভাবেই অতি মাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠবেই। সৈনিক সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খল মনোভাবের এইটাই হয়তো অন্যতম প্রধান কারণ।

অন্ধকার কামরার মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে কোনমতে দাঁড়ানোর

মতো জায়গা ক'রে নিলাম। কিন্তু প্রমাদ গুনলাম হাওড়ার দূরত্ব স্মরণ ক'রে।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। আম্বালা ক্যান্টনমেণ্টে কামরাটার প্রায় অর্ধেক লোক নেমে গেল। উঠলোও কিছু। সেই অবসরে জায়গা ক'রে নিলাম। শুধু বসবার জায়গা নয়, তদুপরি জানলার ধারে একটি কোণ।

সারারাত ট্রেণ চললো। যেমন ভাবে পাঞ্জাব মেল্ চলে, চললো ঠিক তেমন ভাবেই। মনে কোন সন্দেহের রেখাও পড়তে দিলে না সামনে কি অভিনব এক যাত্রাপথ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।

ভোর বেলায় মোরাদাবাদে গাড়ী দাঁড়ালো। মুখ হাত ধোয়া, চা জলখাবার খাওয়ার পালা যথারীতি সাঙ্গ করা গেল। শরীরটাকে ঝালাই ক'রে নেওয়ার জন্যে প্ল্যাটফরমে বেশ খানিকটা পায়চারী করলাম। আর মনে পড়তে লাগলো সেই দুই প্যাকিং বাক্সের কথা।

আবার ট্রেণ চললো। ভালো লাগছিল। ট্রেণের এই গতি যেন মনের মধ্যে দুরন্ত এক আবেগের সঞ্চার করে। সেই মুহূর্তে মনটা বেশ হাল্কা লাগছিল। মিলিটারী জীবন আর আগস্ট আন্দোলন আকীর্ণ পথ—যেন দুয়েরই ঊর্ধ্বে চ'লে গেছে মনটা। চিরন্তন মানবিক আকুতি মনকে পেয়ে বসেছে। মনে পড়েছে বাড়ীর কথা। ছোট ছোট ভাই বোনগুলোর কথা।

রফিকের সঙ্গে পরামর্শ করলাম, ক'দিন কলকাতায় থাকা যাবে।

প্রথমে বললাম, দু'দিন। তার পরেই মনে হ'লো, তিন দিনেই বা কি এমন আপত্তি।

দিনের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়াবার দিকেই ঝোঁকটা প্রবলতর হ'য়ে উঠতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় থাকাকালিন মেজাজের ওপর ছেড়ে দিলাম।

বেলা চারটের কাছাকাছি ট্রেণ লক্ষ্ণৌ পৌছলো।

সমস্ত যাত্রীই যেন প্ল্যাটফরমে নেমে পড়েছে। এখানে ষ্টপেজ একটু বেশী। যাত্রী মানে সবই মিলিটারী। আমাদের কামরার কয়েকজন আবার আসামের যাত্রী। অর্থাৎ ট্রেণটা যেন অঘোষিত মিলিটারী স্পেশ্যালে পরিণত হ'য়ে গেছে।

প্রশ্ন জেগেছে, তাহ'লে বেসামরিক যাত্রীরা গেল কোথায়! তাদের ট্রেণে যাতায়াতের প্রয়োজন কি ফুরিয়ে গেছে! সমস্ত ভারত জুড়েই কি এখন মিলিটারী রাজত্ব! আসামে অবশ্য সেই চেহারাই দেখেছি। কিছু কিছু দোকানদার ছাড়া বেসামরিক মানুষ যেন চোখেই পড়ে না। বিশেষ ক'রে মেয়েরা, অর্থাৎ সমস্ত নারী জাতিটাই যেন ভারত থেকে উবে গেছে।

এ অভিজ্ঞতায় বিস্ময় জাগেনি। লজ্জায় অধোবদন হয়েছি।

আমরা দেশের মাটিকে রক্ষা করি, কিন্তু দেশের মানুষ আমাদের ভয়ে তটস্থ।

বৃটীশের সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে আমরা সৈনিক। তাই বৃটীশ সৈনিকের ছাঁচে ঢালাই হ'তে হ'তে দিনে দিনে আমরাও বৃটীশ মনোভাবাপন্ন হ'য়ে উঠেছি। নারী জাতি সম্বন্ধে বৃটীশ মনোভাব, তথা পাশ্চাত্য মনোভাব আমাদের মনকেও আচ্ছন্ন করেছে। বৃটীশেরই মাসতুতো ভাই ফ্যাসিষ্ট জার্মানির জেনারেল গোয়েরিং বলেছেন, "উইমেন্ আর্ ফর্ দি রিক্রিয়েসন্ অফ্ টায়ার্ড ওয়ারিঅর্স্।"

পাশ্চাত্য দেশের দুই বিরাট জাতি বৃটীশ আর আমেরিকানদের যুদ্ধকালিন দিনগুলোতে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। দেখেছি, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত এই দুই সভ্য জাতির মনোভাব ওই গোয়েরিং সাহেবেরই সমপর্যায়ে।

রফিক খবর আনলে, ট্রেণ ছাড়ার কোন ঠিক নেই। কখন ছাড়বে, সে কথা এ, এস, এম্'রা বলতে পারলো না। এক ঘণ্টার মধ্যে তো নয়ই।

সুতরাং রফিক স্নান করতে গেল।

আমি ব'সে আছি সেই কোণটিতে। মনে হচ্ছে যেন সমস্ত দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছি। আর দু'বছর আগে উনিশশো চল্লিশ সালে এই লক্ষ্ণৌ শহরে সপ্তাহ খানেক কাটিয়ে গিয়েছি। সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত এই সহরেরই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি। এখানে আমার পরিচিত এমন মানুষও রয়েছে, যারা আমাকে দেখলে সত্যিই খুশী হবে।

অথচ আজ আমি গাড়ী থেকে নামতে পারছি না। সন্দেহ জাগছে, দু'বছর আগেকার মতো সেইভাবে রাস্তায় বার হ'তে পারবো কিনা! আমাকে এই পোষাকে দেখলে সেই পরিচিতেরা সত্যিই কি আজ খুশী হবে!

রফিক স্নান সেরে ফিরে এলো। আরও খবর নিয়ে এলো, গাড়ী আজ আর ছাড়বে না। আবার রওনা হবে আগামী কাল ভোরবেলায়। এ অঞ্চলে নাকি এখনও রাতের বেলায় গাড়ী চলছে না।

খবরটা দুঃসংবাদ কি সুসংবাদ, তার কোন তারতম্য করতে পারলাম না।

তবুও এটা একটা মস্ত খবর। বৃটীশ সাম্রাজ্যের রথের চাকা কয়েক দিনের জন্যও তো অচল হয়েছে! এটাই বা কি এমন কম সাফল্য! অভিজ্ঞতা হোক্। সাধারণ মানুষ হাতে-নাতে বিপ্লবের পাঠ নিক্। তবেই তো বিপ্লব হবে সার্থক।

রফিকের বার্তা শুনে মনে যেন নতুনভাবে কোন প্রতিক্রিয়া ঘটলো না। আরও যেন খানিকটা ঝিমিয়ে পড়লাম। সমর্পণ ক'রে দিলাম নিজেকে বিধিলিপির কোলে। হ'য়ে গেলাম এই গাড়ীরই অঙ্গীভূত। গাড়ী যদি না চলে, আমরাও চলছি না।

রফিক বললে, যাননা, ভালো ক'রে স্নান ক'রে আসুন।

কথাটায় কেমন যেন চমকে উঠলাম। রফিকের সেই 'মা-মা' স্বর। সত্যিই তো, কলকাতা ছাড়ার পর প্রায় এক সপ্তাহ হ'তে

চলেছে, এর মধ্যে ভালো ·· স্নানই করা হয়নি একবারের জন্যেও।

স্নানাগার থেকে ফিরে জানতে পারলাম, ট্রেণটাকে সাইডিঙে প্লেস্ করা হবে। তার জন্যে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা গেল।

ভেণ্ডাররা অফুরন্ত উৎসাহে চা আর খাবার বিক্রী করছে।

আমি আবার এক ভাঁড় চা নিলাম।

আমাদের সহযাত্রী জনৈক নায়েক সাহেব স্মিতহাস্যে যেন আমাকে সাদর ভৎর্সনা ক'রে বললেন, বাঙ্গালী লোক বহুৎ চা পীতা হ্যায়।

পাঞ্জাবের অধিবাসী প্রৌঢ় নায়েক সাহেব আম্বালা থেকে আমাদের সহযাত্রী। তাঁর ইউনিট গৌহাটিতে। তিনি আর, আই, এ, এস, সি'র লোক। ফিরছেন ওয়ার্ লিভ্ থেকে।

এইটুকু পরিচয়েই আমাদের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে গেছে। লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে ব'সে মনে হ'লো, পাণ্ডু আর গৌহাটি, যেন দুই পাশাপাশি ক্যাম্পের লোক।

কিন্তু নায়েক সাহেব আমাকে বিব্রত ক'রে তুললেন তাঁর মিলিটারীত্ব দিয়ে। আমি হাবিলদার আর তিনি নায়েক। র‍্যাঙ্কে তিনি আমার থেকে এক ধাপ নিচে। সেই নিচু র‍্যাঙ্কের হীনমন্যতা সময় সময় যেন তোষামোদের মতো মনে হ'তে লাগলো।

তাঁর বাড়ী থেকে আনা খাবার থেকে কিছুটা আমাকে দিলেন। কিন্তু রফিকের দিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। রফিকের যে কোন র‍্যাঙ্ক নেই। সে শুধুই সিপাই।

আমার অংশ থেকে রফিককে খানিকটা দিলাম। মনে হ'লো আমার এই কাজটা যেন নায়েক সাহেবের তেমন মনঃপুত হ'লো না। কট্‌মট্ ক'রে তিনি রফিকের দিকে তাকালেন।

চোখের ইশারায় রফিককে শান্ত রাখা আমার পক্ষে রীতিমত কষ্টকর হ'য়ে পড়েছিল।

নায়েক সাহেবকে আমাদের জিনিষপত্রের ওপর নজর রাখার অনুরোধ জানিয়ে ষ্টেশনের বাইরে গেলাম।

রফিক মহা খুশী। তার লক্ষ্ণৌ শহর বেড়ানো হ'য়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আমার মনটা ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছে। মিলিটারী উর্দি যেন আমার সমস্ত পৌরুষ শুষে নিয়েছে। এই পোষাক দেখে কেউ যদি আমাকে অযথা অপমান করে, আমি তো তাকে প্রত্যাঘাত করতে পারবো না!

ষ্টেশনের বাইরে অনেক মানুষের কলরব। এক্কা আর টাঙ্গার ভীড় পার হ'য়ে এগিয়ে গেলাম আমিনাবাদ রোডের দিকে। রফিককে কথা দিয়েছিলাম, আমিনাবাদ পার্ক পর্যন্ত ঘুরে আসবো। লক্ষ্ণৌ শহরের কিছুটা জৌলুষ চোখে পড়বে।

শহরের প্রবেশ মুখে মস্ত এক নালা। তার উপরে ছোট্ট এক পুল। সেই পুলের ওপর উঠে কেন যেন থমকে দাঁড়ালাম। এইবার তো শহরের সুরু। বুকটা দুরু দুরু ক'রে উঠলো। মনে পড়লো আগস্ট আন্দোলনের সূত্রপাতের সময়কার একটা ঘটনা।

চাপারমুখ ডিট্যাচমেণ্টের লোকেরা ভয় পেয়ে হেড কোয়ার্টারে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল। আর্জি পেশ করার জন্যে এসেছিল এ্যাসিসট্যাণ্ট ষ্টেশন মাস্টার গাঙ্গুলি। তার কাছেই শুনেছিলাম, গ্রামের রাস্তা ধ'রে সে আর সিগন্যালার মিস্ত্রির সেদিন বেড়াতে বেরিয়েছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে কারা যেন তাদের পিছু নিয়েছিল। প্রথমটা আমলই দেয়নি। পরে সংখ্যার আধিক্যটা বুঝতে পেরে একটু যেন ভয় পেয়েছিল। জোরে পা চালিয়ে দিয়েছিল তারা। ক্যাম্পের কাছাকাছি আসতেই তাদের ওপর ইন্টক বর্ষণ সুরু হয়। দৌড়তে দৌড়তে যখন তারা ষ্টেশনের দিকে ছুটছিল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা দেওয়া আততায়ীরা মহা উল্লাসে শ্লোগান দিয়েছিল, 'বৃটীশ—ভারত ছাড়ো।'

লক্ষ্ণৌ সহরের বিরাট ওই নালার ওপরকার পুলের ওপর দাঁড়িয়ে আমার হাত পা থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো। ব্যথায় বেদনায় বুকখানা যেন দুমড়ে মুচড়ে গেল। ওপরে স্বচ্ছ আকাশের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আমাদের উদ্দেশ ক'রে হুঙ্কার দিলে, 'বৃটীশ—ভারত ছাড়ো'—এরা কারা ?

একেবারে এ্যাবাউট্ টার্ণ ক'রে রফিককে বললাম, না রফিক, ফিরে চলো।

রফিক ক্ষুণ্ণস্বরে অনুযোগ করলে, সেই আমিনাবাদ না কি যেন বলছিলেন, সেখানে গেলে হ'তো না ?

বললাম, আমার মনে হচ্ছে, সহরের বেশী ভেতরে না যাওয়াই ভালো। এখানে গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়া দেখে বুঝতেই পারছো, এ অঞ্চলে এখনও গণ্ডগোল আছে।

একেবারেই অশিক্ষিত, সম্পূর্ণ নিরক্ষর রফিক কি বুঝেছিল জানি না। রাজনীতির তত্ত্বের সে ধার ধারে না। আপাদমস্তক আমার দিকে একবার দেখে নিয়ে, সে ঘুরে দাঁড়ালো।

নিশ্চয়ই সে আমাকে কাপুরুষ মনে করেছিল !

দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব মেল্ লক্ষ্ণৌ ছাড়লো।

ঘণ্টা বাজির কোন ত্রুটি ছিল না। অর্থাৎ, ষ্টেশন মাষ্টার লাইন ক্লিয়ারের ঘণ্টা, গার্ড সাহেব ট্রেণ ছাড়ার হুইস্‌ল্—সব অনুষ্ঠানই নিখুঁত ভাবে পালন করেছিলেন।

যাত্রীদের অধিকাংশই হয়তো তখনও ঘুমোচ্ছে। তারা তো এই ট্রেণটারই কলকব্জার সামিল হ'য়ে গেছে।

চলার সুরুতেই খট্‌কা লাগলো। সে এক বিচিত্র পাঞ্জাব মেল্। প্রায় গরুর গাড়ীর মতো মন্থর গতিতে চলেছে।

ঘণ্টাখানেক চলার পর একটা বাঁকের মাথায় দেখা গেল, পর পর তিনখানা ট্রেণ একসঙ্গে চলেছে। সামনের দু'খানা গুড্স, তাদের পেছনে আমাদের মেল্।

দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা জলাঞ্জলি দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওই জিনিষটাতো আর আমার হুকুমে চ'লে না, ওর নিজস্ব নিয়ম আছে। যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে। মনে হয় যুগের পর যুগ অতিক্রম ক'রে চ'লেছি।

বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ কি একটা বড়-সড় ষ্টেশনে এসে আমাদের গাড়ী দাঁড়িয়েছে। ষ্টেশনের নামটা কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। গাড়ী থেকে যাত্রীর দল সকলেই নেমে পড়েছে প্ল্যাট-ফরমে। আজকের দিনের প্রথম ছাড়ার পর ছ'-সাত ঘণ্টা কেটে গেছে। এর মধ্যে এমন একটা ষ্টেশন পাওয়া যায়নি, যেখানে পানি পাঁড়ে বা চা-ওয়ালার টিকিটি দেখতে পাওয়া গেছে। এখানে জল, চা, এমন কি খাবারের ভেণ্ডারদেরও দর্শন পাওয়া গেল।

তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত মানুষগুলো ভেণ্ডারদের ছেঁকে ধরলো। ধৈর্য আর রাখতে পারে না। 'আমাকে দাও', 'আমাকে আগে দাও', করতে করতে এক সময়ে খাবার-দাবার নিজেরাই হাতে ক'রে তুলে নেয়। একটা হট্টগোলের মধ্যে দিয়ে সমস্ত খাবার উধাও হ'য়ে গেল।

অধিকাংশ লোকই খাবারওয়ালাকে পয়সা দিলে। কেউ কেউ আবার দিলেও না।

এ যেন অর্থনীতির গোড়ার কথা। চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ না হ'লেই একটা গোলযোগ দেখা দেবেই। সাধারণ বাজারে ব্যবসায়ীরা এমন গোলযোগ কামনা করে। দাম বাড়িয়ে দাও পিটে নেয়।

কিন্তু খাবারের ভেণ্ডাররা ফেরীওয়ালা, ব্যবসাদার নয়। দাম বাড়িয়ে বাজারে শান্তি বজায় রাখতে পারেনি।

আবার বাজারটাও তেমন ভদ্র নয়। ভদ্রলোকের বাজার হ'লে

ক্রেতারা শান্ত থাকতো। বাজারে দর উঠতো হু হু ক'রে। ক্রয়-ক্ষমতা যখন সামর্থের বাইরে চ'লে যেতো তখন সপরিবারে আত্মহত্যা ক'রে ভদ্রজনোচিত প্রতিবাদ জানিয়ে যেতো এই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

কিন্তু এখানে মিলিটারী নিয়ে কারবার। আর মিলিটারী মানেই সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের মানুষের দল। তাদের নিচে আর কেউ নেই। নিজ হাতে খুঁটে খেয়ে তারা বেঁচে থাকার জন্যে লড়াই ক'রে চলে ভগবান থেকে চৌকিদার পর্যন্ত সকলের সঙ্গেই সমান ভাবে।

রফিকও দুই থাবা ভ'রে যা পেয়েছে, তাই নিয়ে এসেছে।

আমি শিউরে উঠলাম। অলিখিত সমাজতত্ত্বের ধারা অনুসারে আমি ভদ্রলোক।

বললাম, এ কি করলে রফিক ?

রফিক বললে, তাহ'লে কি খাবো ?

সেই আদিম এবং অনন্তকালের প্রশ্ন। জননী জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হ'য়েই কান্না, খাওয়ার জন্যে। আর খাওয়ার জন্যেই এই মিলিটারীতে ভর্তি হওয়া। খাওয়া মানেই তো বাঁচা।

খাবারের ভেণ্ডার হাঁউমাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো। গাড়ীর জানলায় জানলায় এসে হাত পেতে ভিক্ষা চাওয়ার মতো পয়সা চাইতে লাগলো। অনেকেই দিলে। বেচারীর প্রতি সহানুভূতিতে কিছু কিছু পয়সা এমন লোকও দিলে, যারা গাড়ী ছেড়ে নামেওনি। মনে হয় সে যাত্রা খাবারের ভেণ্ডারের বিশেষ লোকসান হয়নি।

আবার গাড়ী চললো।

সে এক বিচিত্র ট্রেণ চলা। ভীত, ত্রস্ত এক জানোয়ারের মতো কয়েক পা চলে, আবার থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে পেছনে তাকিয়ে দেখে, আততায়ী কতদূর !

এ ভয় কাকে ? যে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ এই রেলগাড়ীর জোরে

আঠারোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহ দমন ক'রেছিল; বৃটীশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ রচনাকারি সেই ট্রেণের উদ্ধত গতি আজ খর্ব! কোন মহাশক্তি এ মহাপরাক্রমকে স্তব্ধ করতে সমর্থ হয়েছে।

এ কি সেই মহাশক্তি, যে শক্তি এই রেল লাইন পেতে ভারতে বৃটীশ সাম্রাজ্যের নাগপাশ রচনা করেছিল। সেই শক্তিই কি আজ রেল লাইন উপড়ে ফেলে বৃটীশ সাম্রাজ্যের সেই নাগপাশ ছিন্ন করতে চাইছে!

এই মহাশক্তির মোকাবিলায় বৃটীশ সিংহ আজ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভারত জুড়ে সমস্ত ষ্টেশনে ষ্টেশনে খাস্ বৃটীশ সৈনিক আজ প্রহরায় নিযুক্ত। স্টেশনের চত্বরে চত্বরে তাঁবু ফেলে, ব্রেনগানে গুলি ভ'রে তারা অপেক্ষা করছে। গ্রামে গ্রামে হানা দিচ্ছে বৃটীশ সৈন্য। গ্রামকে গ্রাম উজাড় ক'রে দিচ্ছে।

বাধা দেওয়ার কেউ নেই। যারা ভেতর থেকে বাধা দিতে পারতো, তারা বিচ্ছিন্ন, অসংগঠিত। তারা জানে না, এমন সংগ্রামে তাদের ভূমিকা কি, তাদের অংশ কতটুকু। কাঁটা তারের বেড়ার মধ্যে তারা শৃঙ্খলিত!

একই ভাবে ট্রেণ চলেছে। একটা পুরো ট্রেণ বোঝাই ভারতীয় সৈনিক। নিস্পৃহ দর্শকের মতো ছোট ছোট ষ্টেশনগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে উল্লসিত হ'য়ে ওঠে। কোথাও স্টেশন-বাড়ীটি আগুনের লেলিহান শিখায় দগ্ধ। কোথাও সিগ্ন্যাল্ পোষ্টগুলো লাইনের ধারে ধারে মুখ থুবড়ে প'ড়ে রয়েছে। কোথাও কোন কাল্ভার্টের ধারে বৃটীশ সৈনিক মোতায়েন।

ট্রেণের যাত্রী ভারতীয় সৈনিক পরম উল্লাসে দেখছে।

কি দেখছে, তাদের জিজ্ঞেস করলে, তারা বলতে পারবে না।

তবুও তাদের উল্লাস, বৃটীশ সরকার জব্দ হয়েছে ব'লে। বৃটীশ সৈনিকগুলি স্টেশনে স্টেশনে, পুলের মুখে মুখে, কাল্ভার্টের ধারে ধারে

মোতায়েন। ভারতের প্রখর গ্রীষ্মে তারা যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। ঘামে জামা কাপড় লেপ্‌টে গেছে গায়ের সঙ্গে। কেউ জামা খুলে ফেলেছে। কেউ আবার জামা-প্যান্ট খুলে শুধু আণ্ডারওয়্যারটা প'রে আছে।

ভারতীয় সৈনিকেরা ওইটুকুতেই খুশী। ওই ওরাই তো কোম্প্যানি গুলোতে ভারতীয় সৈনিকদের 'বাষ্টার্ড ইণ্ডিয়ান' বলে। ওরাই তো ভারতীয় সৈনিকদের দিয়ে ওদের মোট বহায়। ওরাই তো ভারতীয় সৈনিকদের ব্যাট্‌ম্যান্‌ রাখে—তাদের দিয়ে বুট পালিশ করায়। ভারতীয় সৈনিকরা যখন ডাল-ভাত বা ডাল-রুটি দিয়ে দিনের খাওয়া শেষ করে, তখন ওদের জন্যে বরাদ্দ পরিজ, মাখন-রুটি, মার্মালেড্‌, জ্যাম, টিনের মাংস, টিনের মাছ, ডিমের গুঁড়ো। তদুপরি আছে অঢেল মদের সরবরাহ।

একটা বেশ বড় গোছের কাল্‌ভার্টের ওপর দিয়ে পাঞ্জাব মেল পাঁচ মাইল স্পীডে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। জানলা দিয়ে হুমড়ি খেয়ে গাড়ীশুদ্ধ লোক কি যেন বিশেষ একটা জিনিষ দেখছে। যাদের দেখা হ'য়ে যাচ্ছে, তারা উল্লাসে ফেটে পড়ছে। যাদের কামরা তখনও কালভার্টের ওপর আসেনি, তারা আরও খানিকটা ঝুঁকে পড়ছে।

দ্রষ্টব্য জিনিষটি একটি ইঞ্জিন। যেমন ইঞ্জিন আমাদের এই গাড়ীটাকে টানছে। ঠিক সেই একই রকম ইঞ্জিন। কালভার্টের নিচে প'ড়ে আছে উল্টে, অনেকটা কচ্ছপের মতো। চাকাগুলো তার ওপর দিকে।

জেমস্‌ ওয়াটের আবিষ্কার বাষ্পের শক্তি। সেই বাষ্পিয় শক্তি এনেছিল শিল্প বিপ্লব। সেই শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ড আজ পৃথিবীর অধিশ্বর। বৃটিশ রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না।

সেই বাষ্পিয় শক্তির ওই অসহায় রূপ কিসের ইঙ্গিত বহন করছে?

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম দশা, না ভারতের বিপ্লবী শক্তির অভ্যুত্থান!

ইতিহাস কলঙ্কিত ক'রে এই দুই বৈপরিত্যের অপূর্ব এক সমন্বয় ঘটেছে ভাবিকালে আমাদেরই এই ভারতভূমিতে !

বেনারস ক্যান্টনমেন্ট হ'য়ে পাঞ্জাব মেল মোগলসরাই পৌছালো।

তখন সন্ধ্যে উত্‌রে গেছে।

এখানেও সেই একই খবর। রাতে ট্রেণ ছাড়বে না।

গুঞ্জন উঠলো কামরায় কামরায়। এমন ক'রে কতদিনে গন্তব্য স্থলে পৌছানো যাবে। পথের রসদ তো শেষ হয়েছে। ষোল টাকা মাইনের সেপাইয়ের পকেট খরচের পয়সাও খতম্। এখনও যে অনেক পথ বাকী !

এ গুঞ্জন চলতেই থাকে। চলতে চলতে এক সময়ে আর, টি, ও'র আপিস পর্যন্ত ধাওয়া করলো ! আর, টি, ও, ক্যাপটেন ভরসা রাখতে পারেন না ভারতীয় সৈনিকের আনুগত্যের ওপর ! আত্মরক্ষার জন্যে রিভলভারের গ্রিপে হাত রেখে জবাব দেন, আমাদের কিচ্ছু করার নেই। আমরা কিচ্ছু করতে পারবো না !

মোগলসরাইয়ের বাজারে একটা দোকান লুঠ হ'লো। মিলিটারী পুলিশ ছুটে এলো শান্তি রক্ষা করতে। লাল পাগড়ি সব কোথায় যেন উধাও হ'য়ে গেছে !

দেখতে দেখতে দোকান পাট সবই বন্ধ হ'য়ে যায়। ষ্টেশনে একটা ভেণ্ডার নেই। খাবারের স্টলে ঝাঁপ ফেলা। রিফ্রেশমেন্ট রুমে তালা বন্ধ। অভুক্ত কয়েক হাজার সৈনিক হন্যে কুকুরের মতো চারিদিক ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়।

তারপর কি এক অজানা কারণে হঠাৎ সকলে শান্ত হ'য়ে যায়। যে যার কামরায় এসে নিরিহ ভালোমানুষটির মতো ব'সে থাকে।

অনেক পরে অন্তর্নিহিত কারণটি প্রঃ

রফিক খবর আনে, মিলিটারী পুলিশ চারজন সৈনিককে তাদের মালপত্তর সমেত গ্রেফ্‌তার ক'রে নিয়ে গেছে।

পরদিন ট্রেণ ছাড়লো একদল বিক্ষুব্ধ সৈনিক নিয়ে, যাদের জঠরে ক্ষুধার জ্বালা আর মনে মিলিটারী পুলিশের ভয়।

সমস্ত রাস্তাটা এই মানুষগুলো চারিদিকে তোলপাড় করতে করতে চললো। ষ্টেশনগুলোয় একজন মানুষ দেখা যায় না! কাজেই তাদের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়লো লাইনের ধারে ধারে ক্ষেত খামারের ওপর।

প্রথমটা খাদ্যাখাদ্য বিচার ছিল। তারপর বিবেকহীন বিচারহীন, সংহার মূর্তি। ক্ষেতে খাওয়ার মতো কিছু পেলে ট্রেণের অর্ধেক লোক নেমে যায় মাঠের মধ্যে। দু'হাত ভ'রে তুলে নিয়ে আসে ফলন্ত ফল মূল। আর যদি কোন ক্ষেতের ফসল খাওয়ার যোগ্য না হয়, তাহ'লে বুট পায়ে মাড়িয়ে তচনচ ক'রে দিয়ে আসে মাঠের পর মাঠ।

আক্রোশ মেটাবার এই বর্বর পথ সুগম ক'রে দেয় আমাদেরই ট্রেণ।

এক মাইল, আধ মাইল চলে, আবার দাঁড়িয়ে পড়ে পনেরো মিনিট, আধ ঘণ্টার জন্যে। সামনে চলেছে পাইলট ইঞ্জিন, তার সামনে একটা খোলা ওয়াগন। সেই ওয়াগনে আছে বাইপডে ফিট্ করা দুটো ব্রেন্‌গান্। আর আছে রেলের পার্মানেণ্ট ওয়ে বিভাগের লোক লস্কর, সঙ্গে তাদের যন্ত্রপাতি আর সাজ সরঞ্জাম। তারা লাইন পরীক্ষা করতে করতে যাচ্ছে। যেখানে দরকার সেখানে নেমে একটু আধটু মেরামত করছে। তারপর আবার গাড়ী চলছে।

এমনই ভাবে আমরা এলাম গয়ায় বেলা প্রায় চারটের সময়। এবং সেইখানেই সেদিনকার মতো রাত্রিবাস।

ট্রেণটাকে আর প্ল্যাটফরমে নেওয়া হয়নি, একেবারে সাইডিঙে

প্লেস্ ক'রে দেওয়া হ'লো। আগে থাকতেই প্রচুর মিলিটারী পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে।

•মিলিটারী পুলিসেরাই আজ্ঞা জারি ক'রে দিলে, কেউ •বিনা হুকুমে ট্রেণ থেকে নামতে পারবে না।

একটু পরেই ঘোষণা করা হ'লো, আধঘণ্টার মধ্যেই আর, টি, ও'র আপিসে চা আর বিস্কুট দেওয়া হবে। আর ছ'টার মধ্যে দেওয়া হবে খানা।

সে রাত শান্তিতেই কাটলো।

পরদিন ট্রেণ ছাড়লো অতি প্রত্যুষে।

চমকে উঠে দেখলাম, স্বাভাবিক গতি আবার ফিরে পেয়েছে পাঞ্জাব মেল্। বাঙলার সীমারেখার দিকে দ্রুততর গতিতে এগিয়ে চলেছে। চলেছে নিরুপদ্রব এলেকা দিয়ে।

গতি লেগেছে শরীরের কোষে কোষে! কেমন যেন চঞ্চল হ'য়ে উঠতে লাগলাম। কী যেন এতক্ষণ আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। যেন ছিলাম স্বপ্নের ঘোরে। জাল বুনে চলেছিলাম উর্ণনাভের মতো। নতুন এক ভারতকে ঘিরে স্বপ্নের সোনার জাল!

দমকা বাতাসের ঝাপটায় সে জাল ছিঁড়ে গেল। পাঞ্জাব মেলের দুরন্ত গতিতে কামরার জানলা দিয়ে আসছে গরম হাওয়ার ঝলক। জামার বোতামগুলো খুলে দিলাম। কামরার দেয়ালে এলিয়ে দিলাম মাথাটা।

রফিককে বললাম কলকাতায় চ'লে যেতে।

আমি যাত্রা বদল ক'রে যাবো। নেমে যাবো আসানসোলে। ওখানে আমার এক বোন আছে। লড়াইয়ে ভর্তি হওয়ার পর তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

পাঞ্জাব মেলের এতো স্পীড্ যেন বরদাস্ত হচ্ছিল না।

আবার ফিরে এলাম পাণ্ডু ক্যাম্পে।

অবশ্য সোজাসুজি আসিনি। রফিকের সঙ্গে কথা হয়েছিল, তিনদিন কলকাতায় থাকবো! শেষ পর্যন্ত আরও একদিন স্ক্রাউ নিয়েছিলাম।

বাড়ীতে ঘরের মধ্যেই কেটে গেছে ওই চারটি দিন। বাইরে বারই হইনি বলা চলে। বন্ধু বান্ধব কারও সঙ্গেই দেখা করিনি। কেমন যেন অনুভব করেছি, তাদের সঙ্গে আমার জীবনের ধারা বুঝিবা আর খাপ্ খাবে না। জীবনের ধ্যান ধারণা সবই বুঝি পাল্টে গেছে।

কেমন যেন নতুন নতুন ঠেকেছিল বাড়ীর আবহাওয়া। আমার জন্যে অপেক্ষাকৃত সুখাদ্যের আয়োজন চলে বেলার পর বেলা। তারই সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কিন্তু আমার মিলিটারী জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিস্পৃহতা। কেমন যেন মনে হয়েছিল, বাড়ী ছেলে ব'লে ঘৃণা করতে হয়তো তাঁদেব আত্মিয়তাবোধে আটকাচ্ছে। নতুবা সমস্ত সৈনিকদেরই সম্পর্কে তাঁদের বুকভরা ঘৃণা।

সে এক বিচিত্র জাতীয়তাবোধের যুগ। অক্ষমের সঙ্কীর্ণ স্বদেশ প্রেম। দুনিয়াজোড়া ঘটনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে, নিজ সম্প্রদায়কে জাতি জ্ঞান করা আর ব্যক্তিগত স্বার্থকে স্বদেশপ্রেমের তক্‌মা ভূষিত করা।

বুকভরা এই অভিমান নিয়ে কোম্পানিতে ফিরলাম। বিশ্বজোড়া দুনিয়াটা থেকে আমার সমস্ত আনন্দ উবে গেছে। বিচিত্র এই মনের অবস্থা নিয়ে সৈনিক জীবনকে নতুন চোখে দেখলাম।

ইতিমধ্যে কোম্পানির পনেরোটা দিন কেটে গেছে। অনেক রদ-বদল হ'য়ে গেছে এই সময়টুকুর মধ্যে। মেজর চৌধুরী বদলি হ'য়ে গেছেন আমাদের কোম্পানি থেকে। এসেছেন নতুন কমাণ্ডিং অফিসার মেজর বাইওয়াটার।

মোহিন্তই আমাকে গোপন খবর জানালে। মেজর চৌধুরীকে

এই বাঙালীপ্রধান কোম্পানি থেকে হেড্ কোয়ার্টারসের নির্দেশে অপসারণ করা হয়েছে। আগষ্ট আন্দোলনের সময়ে বাঙালীপ্রধান একটা কোম্পানিতে একজন বাঙালী কমাণ্ডিং অফিসার রাখতে উর্ধ্বতন কর্তারা ইতস্তত করেছেন।

কথাটা বিস্ময়কর লেগেছিল। মেজর চৌধুরী নামটা বাঙালী। কিন্তু অফিসার হিসাবে তাঁর সম্বন্ধে বাঙালীদের কোন অনুভূতি কেউ কোনদিন অনুভব করেছে ব'লে আমার মনে হয়নি।

তথাপি এইটাই ঘটনা যে, শাসক গোষ্ঠির সাহেবদের ওপর যতো অনুরাগই আমাদের থাক না কেন, আমাদের প্রতি তাঁদের অনুরাগ সর্বদাই আপেক্ষিক।

ক্যাম্পে পদার্পণ ক'রে হেড্ আপিসে যেতেই প্রৌঢ় মজুমদার মশাই ব'লে উঠলেন, এসেছো বোস, টেরী সাহেব যে তোমার বিহনে অন্ধকার দেখছেন!

এমন খবর শুনে খুশীই হ'লাম। আবার কেন যেন মুচকে হাসলাম। বোধ হয় মেজর চৌধুরীর কথা মনে প'ড়ে গিয়েছিল। মেজর চৌধুরীও একজন দক্ষ অফিসার হিসাবে হেড্ কোয়ার্টারসের প্রিয়পাত্রই ছিলেন, এমন খবর হেড্ আপিসে ব'সে অনেকবার শুনেছি।

টেরী সাহেবের সঙ্গে তাঁবুতে দেখা করলাম। তাঁর কাছেই প্রথম আমার অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ দিতে হ'লো।

আবার ট্রাফিক আপিসের ভার নিতে হ'লো।

আমার অনুপস্থিতির জন্যে ট্রাফিক আপিস উঠে যায়নি—এ সংবাদটা নিশ্চয়ই কোন কেরাণীর কাছে মনোরঞ্জনের কারণ হ'তে পারে না। তবুও লেফটেনাণ্ট টেরী যখন বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রচণ্ড অসুবিধে হয়েছে, আপিসের কাজ তাঁর মনোমতভাবে চলেনি—তখন নিশ্চয়ই আপ্লুত হ'য়ে উঠেছিলাম।

কেরাণীগিরি বাঙালীর মজ্জাগত পেশা। তাই বোধহয় সুযোগটা ঠিকই গ্রহণ করেছিলাম।

টেরী সাহেবের কাছে আর্জি পেশ করেছিলাম আমাকে কেরাণীগিরি থেকে রেহাই দিয়ে গার্ডের কাজ শেখার এবং করার সুযোগ দিতে।

যথাকালে আমার আর্জি মঞ্জুর হয়েছিল।

আবার সেই ট্রাফিক আপিস, সেই রফিক আর আমি। সেই গার্ডের কল্-বুক। সেই সিফ্ট ডিউটি। সেই এ, এস্, এম; পয়েন্টস্‌ম্যান্ আর সিগ্‌ন্যালারদের হিসাব নিকাশ।

জীবনটা কেমন যেন থিতিয়ে যেতে থাকে।

এমনই সময়ে একটা ঘটনা ঘ'টে গেল কোম্পানিতে। সে ঘটনা মিলিটারী রাজত্বের অনেক রহস্য উদ্ঘাটন ক'রে দিয়েছিল আমার কাছে!

সেদিন সকালে লেফ্‌টেনান্ট টেরী সবে মাত্র আপিসে এসেছেন। নিত্যকর্ম পদ্ধতি অনুসারে আমি তাকে আগের দিনের হিসাবপত্র দেখাচ্ছি।

এমন সময় জমাদার সাহেব ডি, সি, পালিওয়াল নামে একজন গার্ডকে সার্টের কলার ধ'রে টানতে টানতে এনে টেরী সাহেবের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

সে দৃশ্য দেখে লেফ্‌টেনান্ট টেরী বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে কেন জানি না, প্রথমে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি জানি, মুখখানা আমার আরক্ত হ'য়ে উঠেছিল। হয়তো রাগে, অপমানে আমার সমস্ত শরীর থরথর ক'রে কাঁপছিল।

ডি, সি, পালিওয়াল একজন রাজপুত। র‍্যাঙ্কে সিপাই। ক্যাটেগরীতে গার্ড। আমারই মতো মধ্যবিত্ত ঘরের একটি ছেলে। শিক্ষিতও—তা না হ'লে আর গার্ড হয় কি ক'রে! তার দৈনন্দিন ব্যবহারে দেখেছি, বেশ সপ্রতিভ, মিশুক আর সরল।

এই রকম একটি ছেলেকে এমনভাবে জামার কলার ধ'রে টেনে

আনার মধ্যে সাধারণ সৈনিককে যে পরিমাণ হেয় জ্ঞান করার মনোভাব প্রকাশ পায়, সে মনোবৃত্তিকে সহ্য করা অসম্ভব। একটা ঝটকা মেরে আমি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম।

টেরী সাহেবের উচিত ছিল (মিলিটারী কানুন অনুসারে) জমাদার সাহেবকেই প্রথম প্রশ্ন করা। কিন্তু পালিওয়ালকেই তিনি প্রথমে প্রশ্ন ক'রে বসলেন, কি ব্যাপার পালিওয়াল ?

কী যে হ'লো! টেরী সাহেবের প্রশ্ন শুনে পালিওয়াল ছেলে মানুষের মতো কেঁদে ফেললে। বললে, সাহেব, মিলিটারীতে ঢুকে আজ আমি চোর ব'নে গেলাম!

লেফটেনাণ্ট টেরীর স্বভাবটা ছিল কোমল। পালিওয়ালের চোখে জল দেখে মনটা বোধ হয় তাঁর আরও নরম হ'য়ে গেল। এতক্ষণে তিনি জমাদার সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, পালিওয়াল কি করেছে জমাদার সাহেব ?

জমাদার সাহেব সম্ভবত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁকে আগে প্রশ্ন না ক'রে, আসামীর সঙ্গে আগে কথা বলা—এটাকে তিনি তাঁর র‍্যাঙ্কের প্রতি অমর্যাদা ব'লেই ধ'রে নিয়েছিলেন।

তা হ'লেও তিনি কর্তব্যে অটল। অভিযোগ পেশ করলেন সামরিক রীতিতে—স্যাপার পালিওয়াল আলু-ছাড়ানো ফেটীগ খাটছিল এবং সেই সঙ্গে ছাড়ানো আলুও খাচ্ছিল। সেই কথা তাকে বলায়, সে আমার সঙ্গে অত্যন্ত রুক্ষ ভাষায় কথা বলে। তাকে আমার সঙ্গে আপিসে আসার হুকুম দেওয়া সত্ত্বেও সে আমার হুকুম অগ্রাহ্য করে। তার ব্যবহারে অবাধ্যতা প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থাৎ পালিওয়ালের আর কোন নিষ্কৃতির পথ নেই। মিলিটারীতে এই একটি অভিযোগ থেকে কখনই রেহাই পাওয়া যায় না। অবাধ্যতার কি কোন ক্ষমা থাকতে পারে! ওই বাধ্যতাটুকুই তো মিলিটারী রাজত্বের মূল বনিয়াদ!

যদিও ইণ্ডিয়ান আর্মি এ্যাক্টের ২৮ (ই) ধারায় অবাধ্যতা সম্বন্ধে লেখা আছে, disobeying lawful command of the superior officer. কিন্তু ওই ল'ফুল কথাটা যে কেমন ক'রে ব্যবহারিক প্রয়োগের সময় বাদ প'ড়ে যায়, সেই বিষয় নিয়ে আর যেই গবেষণা করুক না কেন, সাধারণ সৈনিকদের ওই ব্যাপারে দন্তস্ফুট করার অধিকারটা পর্যন্ত কখন যেন কি ভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছে!

অফিসাররা জানেন, হুকুম মানা সৈনিকদের একমাত্র কাজ। কাজেই তাঁরা যে কোন হুকুমই করুন না কেন, একজন অধস্তন সৈনিককে বিনা বাক্যব্যয়ে তা মানতেই হবে। হুকুম—হুকুমই। তার আবার ন্যায় অন্যায় কি! আইনী আর বেআইনীই বা কি!

টেরী সাহেব কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। ব্যাপারটা যেন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। পালিওয়াল আলু খায়নি। তবুও তাকে আলু চোর বলাতে প্রথমে সে প্রতিবাদ করেছে। তারপর ক্ষুব্ধ হয়েছে। তারপর রুক্ষ হয়েছে। তারপর জমাদার সাহেবের হুকুম অমান্য করার মতো বেপরোয়া হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু জমাদার সাহেব একেবারে পাশুপাত অস্ত্র হেনেছেন। অবাধ্যতা! এ অস্ত্রে একজন সৈনিককে ধরাশায়ী হ'তেই হবে।

কেমন যেন মনে হ'লো, টেরী সাহেব পালিওয়ালকে বাঁচাবারই পথ খুঁজছেন। তাঁর যেন ইচ্ছেটা, আমার সঙ্গে একটু পরামর্শ ক'রে নেন। কিন্তু সে উপায়ও নেই। জমাদার সাহেব সামনে। তিনিও একজন অফিসার—ভাইসরয় কমিসন্‌ড্‌ অফিসার। ভাইসরয়ই তো ভারতের প্রত্যক্ষ কিং।

পালিওয়ালকে বাঁচানোর উপায়ই যদি না খুঁজবেন, তাহ'লে এতো ভাববারই বা কি এমন থাকতে পারে! তিনি তো জানেন, জমাদার সাহেব এই অভিযোগটুকু নিয়ে যদি মেজর বাইওয়াটারের সামনে দাঁড়াতে পারেন, তা হ'লেই পালিওয়ালের আঠাশ দিন শক্ত্‌ কয়েদ।

টেরী সাহেব পালিওয়ালকে জেরা করলেন।

পালিওয়াল ঘটনার আদ্যোপান্ত অকপটে ব'লে গেল। সে স্বীকার করলো, জমাদার সাহেবের হুকুম সে মানেনি। সকলের সামনে বার বার তাকে ওই ছোট কাজের জন্যে মিছেমিছি দোষী করায় তার মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে। তার মনে হয়েছিল, জমাদার সাহেবের হুকুম শুনে যদি সে সুড়সুড় ক'রে উঠে যায়, তা হ'লে সকলেই মনে করবে, সে সত্যসত্যই দোষী।

দোষী দোষ স্বীকার করলে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য—এমনই একটা মনোভাব নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে লেফটেনান্ট টেরী জমাদার সাহেবের দিকে তাকালেন।

কিন্তু জমাদার সাহেব তাঁর অভিযোগ থেকে সূচ্যগ্রও পশ্চাদপসরণ করলেন না।

টেরী সাহেবের ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছিল, পালিওয়াল বুঝিবা এ যাত্রা বেঁচে গেল।

কিন্তু জমাদার সাহেবের ভাবগতিক দেখে বোঝা গেল, টেরী সাহেবেরও ক্ষমতা নেই পালিওয়ালকে বাঁচানোর।

কারণ, মিলিটারী বিচার পদ্ধতিতে অভিযোগকারীই প্রধান সাক্ষী। কাজেই, জমাদার সাহেব যদি বলেন, পালিওয়াল আলু খেয়েছে, তা হ'লেই প্রমানিত হবে যে, পালিওয়াল আলু চুরি ক'রে খাওয়ার অপরাধে অপরাধী। পালিওয়াল শতবার অস্বীকার করলেও কেউ সেকথা শুনবে না। তামা-তুলসী-গঙ্গাজল, গীতা, বাইবেল, কোরাণ—সব ক'টা হাতে নিয়েও যদি অস্বীকার করে, তা হ'লেও গ্রাহ্য হবে না। পালিওয়াল যদি কোম্পানিশুদ্ধ লোককে সাক্ষী মানে, তাদের একজনকেও ডেকে একটা কথাও জিজ্ঞেস করা হবে না। জমাদার সাহেবের অভিযোগে পালিওয়ালকে শাস্তি পেতেই হবে।

লেফটেনান্ট টেরী আর একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন।

সে দৃষ্টি বড় অসহায়। বিচারের ভার তাঁর ওপর নয়। মেজর সাহেবের কাছে গেলে পালিওয়ালের শাস্তি হবেই, তা তিনি জানেন। অথচ তিনি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন, ন্যায়ের বিচারে পালিওয়ালের দোষ নেই। মিথ্যা অভিযোগে তাকে উত্যক্ত ক'রে তোলা হয়েছে, তারই ফলে সে উদ্ধত হ'য়ে উঠেছে।

সৈনিকরাও যে মানুষ, এ কথাটা লেফটেনাণ্ট টেরী সাধারণত ভুলে যেতেন না।

কিন্তু মিলিটারী বিভাগ বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বপ্রধান হাতিয়ার। সেখানে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম নীতিটা প্রয়োজনীয় সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে। বৃটিশের প্রয়োজন সাম্রাজ্য রক্ষা—সে যে কোন উপায়েই হোক। বেয়নেটের ডগায় সে কাজ হয় সব চেয়ে সুষ্ঠুভাবে। কাজেই বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা—এ সব নিতান্তই ছেঁদো কথা।

তার পরের ঘটনা লেফটেনাণ্ট টেরীর বাস্তব বুদ্ধির অপরিপক্কতার পরিচায়ক।

জমাদার সাহেবের সঙ্গে লেফটেনাণ্ট টেরী লঙ্গরখানায় গেছেন। যারা ফেটীগ খাটছিল, তাদের জনে জনে জিজ্ঞেস করেছেন পালিওয়ালের ব্যবহার সম্পর্কে। তারপর একটা সমন্বয় সাধন করেছেন জমাদার সাহেব আর স্তাপার পালিওয়ালের মধ্যে। আলু চুরি ক'রে খাওয়ার অপবাদ থেকে রেহাই দিয়েছেন পালিওয়ালকে। কিন্তু অবাধ্যতার জন্যে একস্ট্রা ফেটীগ্ খাটার শাস্তিও দিয়েছেন তাকে।

ব্যাপারটা তখনকার মতো চুকে গেল। কিন্তু শেষ নিষ্পত্তি তখনও রইলো মুলতুবি।

দুটো বিপরীত ধারা কোম্পানির মধ্যে বইতে লাগলো। লেফটেনাণ্ট টেরীর প্রতি কোম্পানির ছেলেরা যেন বিশেষভাবে অনুরক্ত হ'য়ে পড়লো আর জমাদার সাহেবের প্রতি কেমন যেন প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্যের ভাব।

জমাদার সাহেব ঘটনাটাকে ওইখানেই শেষ হ'তে না দিয়ে, তার জের টেনে নিয়ে গেলেন সুবেদার সাহেবের কাছে, এবং অবশেষে উভয়ে মিলে পৌঁছে দিলেন কমাণ্ডিং অফিসার মেজর বাইওয়াটারের কানে।

মেজর বাইওয়াটার বুঝলেন, লেফটেনাণ্ট টেরী কোম্পানির মধ্যে ভি, সি, ও'র মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছেন। অর্থাৎ নিয়মানুবর্তিতার বনিয়াদেই কুঠারাঘাত করেছেন।

এ সম্পর্কে লেফটেনাণ্ট টেরীকে মেজর বাইওয়াটার কি বলেছিলেন, তা কোন দিন জানতে পারি নি। আর জানার কথাও নয়।

কিন্তু এটা জেনেছিলাম, পালিওয়াল ইন্সিডেণ্ট নিয়ে মেজর বাইওয়াটার আর লেফটেনাণ্ট টেরীর মধ্যে রীতিমত বচসা হয়েছিল।

মাস ঘুরতে না ঘুরতে খবরটা রাষ্ট্র হ'য়ে পড়লো—লেফটেনাণ্ট টেরী বদলি হ'য়ে যাচ্ছেন একশো উনপঞ্চাশ কোম্পানি থেকে।

কেমন যেন খটকা লেগেছিল। তাঁর প্রমোশনের খোস্ খবর কারও মুখে শুনতে পাই না, অথচ বদলির কথা সকলের মুখে মুখে। এই কয় মাসের অভিজ্ঞতায় জেনেছি, অফিসারের বদলি হওয়া মানেই প্রমোশন। বদলি আর প্রমোশন, যেন 'কান টানলে মাথা আসার মতো।

তবে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেন ?

তবে কি এটা পালিওয়াল ইন্সিডেণ্টের পরিণতি।

সুদীর্ঘ সাড়ে চার বছর সৈনিক জীবন অতিবাহিত করেছি। এই কালটুকু আমার জীবনে ঘটনাবহুল। অনেক কিছুই দেখেছি। যা দেখেছি, তাতে আমার পুঁথিগত জীবনের ধ্যানধারণাকে ওলট-পালট ক'রে দিয়েছে।

তার মধ্যে এইটিই বোধহয় একটি মাত্র ঘটনা, যখন কোম্পানির সমস্ত সৈনিক একটি মানুষকে কেন্দ্র ক'রে একই ব্যথায় ব্যথিত বোধ করেছে!

কোম্পানির ছেলেরা নিজেদের উদ্যোগে লেফটেনাণ্ট টেরীকে এক অভূতপূর্ব বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছিল।

জানতে এবং বুঝতে দুইই পেরেছিলাম, অনেকেই, মানে কর্তৃপক্ষ তরফের প্রায় সকলেরই ভালো লাগছিল না লেফটেনাণ্ট টেরীকে নিয়ে এতোটা বাড়াবাড়ি। তবুও তাঁরা বাধা দিতে পারেননি। কারণ, এ ব্যাপারে বাধা দেওয়াটা যে চালের ভুল হবে, সেটুকু বুঝবার মতো কূটবুদ্ধি তাঁদের ছিল।

চোখের জলে একজন মিলিটারী অফিসারকে তাঁর অধীনস্থ সৈনিকরা বিদায় দিলো—এমন দৃশ্য আমার মিলিটারী জীবনে ওই প্রথম দেখলাম। গার্ড-অফ-অনার নয়, মার্চ পাষ্ট'ও নয়—কোম্পানিতে উপস্থিত শ'খানেক ছেলে নীরবে কেবল কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছিল আর বুকের মধ্যে গুরুভার এক বোঝা ব'হে বেড়াচ্ছিল।

আর ওই শেষ। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর কখনও দেখিনি।

সাড়ে চার বছর মিলিটারীতে কেটেছে। ক্লার্ক হ'য়ে ভর্তি হ'য়েও, পরে গার্ড হয়েছি। গার্ড হিসাবে কাজও করেছি মাঝে মাঝে। কিন্তু কেরাণীত্ব আমার ঘোচেনি। বেশীর ভাগ সময় কোম্পানি আপিসেই কেটেছে।

এই সময়ের মধ্যে মোট সাতচল্লিশজন অফিসার আমাদের কোম্পানিতে এসেছে, কিছুকাল থেকেছে—আবার বদলি হ'য়ে চ'লে গেছে অন্য আর এক কোম্পানিতে। তাদের মধ্যে ছিল খাস ইংরেজ, অষ্ট্রেলিয়ান, কানাডিয়ান, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—বৃটীশ কমন্ওয়েলথের প্রায় সব দেশেরই লোক। তা ছাড়াও ছিল ভারতের সব প্রদেশেরই কৃতী সুসন্তানেরা—বাঙালী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, মাদ্রাজী প্রভৃতি।

আশ্চর্য কথা, এদের সকলকেই একই রকম মনে হয়েছে। আচারে ব্যবহারে, কথায়-বার্তায়, মনোভাবে, দৃষ্টিভঙ্গিতে—কোন পার্থক্যই টানতে পারিনি ভারতীয় আর অভারতীয়দের মধ্যে। বাঙালী আর এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, পাঞ্জাবী আর খাস ইংরেজ, সবই যেন বিশেষ এক বিধাতার কারখানায় একই ছাঁচে ঢালাই করা যন্ত্র বিশেষ!

এই অপরূপ সাদৃশ্যের কারণ বোধহয়, একই নামে অভিহিত হওয়ার ফল। এরা সকলেই বৃটীশ অফিসার। মিলিটারীতে অফিসার মানেই বৃটাশ অফিসার—সর্বক্ষেত্রে বর্ণে না হোক, মর্মে সকলেই বৃটীশ।

টেরী সাহেবের ট্রেণ ষ্টেশন ছেড়ে চ'লে গেছে।

ক্যাম্প থেকে কিছু লোক হুকুম নিয়ে, আর কিছু হুকুম না নিয়েই ষ্টেশনে এসেছিল টেরী সাহেবকে ট্রেণে তুলে দিতে। সেই ম্রিয়মান মানুষগুলো ছোট ছোট দলে ক্যাম্পে ফিরছে।

মোহিন্ত আমার পাশে পাশে চলেছে। কখন যে সে আমার পাশে এসেছে, টের পাইনি।

মোহিন্ত বললে, চলুন বোস, আমরা নদীর ধার ধ'রে যাই।

পাণ্ডুতেও আমাদের ক্যাম্প ব্রহ্মপুত্রের ধারেই। ষ্টীমার কোম্পানির কোয়ার্টারগুলোর পেছনেই।

নদীর ধারটা নির্জন। মোহিন্ত একান্তে আমাকে খবরটা দিলে, মেজর বাইওয়াটারের রিপোর্টের ওপরই নাকি লেফটেনাণ্ট টেরী বদলি হ'য়ে গেল। ছ'মাসের জন্যে নাকি তাঁর প্রমোশন বন্ধ। বদলিটা শাস্তি হিসেবেই হয়েছে।

বিস্মিত হইনি। আট-ন'মাসের অভিজ্ঞতায় এ ঘটনার স্বাভাবিকতা হৃদয়ঙ্গম করার মতো অন্তর্দৃষ্টি জন্মেছিল। কিন্তু স্বভাব তো বদলায়নি। তাই করুণ হেসে মোহিন্তকে

বলেছিলাম, মানুষকে ভালোবাসার জন্যে শাস্তি! ভারী মজার ব্যাপার না?

এই ঘটনার পর থেকে মোহিন্তর সঙ্গে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতর হ'য়ে উঠলো। এতোদিন ছিল ভাসাভাসা। দেখা হ'লে দু'একটা কুশল-বার্তা পর্যায়ের কথায়ই কথা শেষ হ'য়ে যেতো। পার্বতিপুর স্টেশনের আলোচনার জের মোহিন্তও টানেনি, আমিও উল্লেখ করিনি।

কিন্তু লেফটেনান্ট টেরীর অপসারণের পশ্চাৎপট হয়তো মোহিন্তর মনকে একটু নাড়া দিয়েছিল। হয়তো সেই জন্যেই সে উপযাচক হ'য়ে এতো বড় একটা গোপন তথ্য আমার কাছে প্রকাশ না ক'রে পারেনি। আর এই গোপনতার অংশিদার হওয়ার ফলেই হয়তো সে নিজে থেকে আমার আরও কাছ ঘেঁষে এলো।

লেফটেনান্ট টেরী চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রাফিক আপিস গেল বন্ধ হ'য়ে। আমি খুশীই হয়েছিলাম। ইতিমধ্যে আমি গার্ড ক্যাটেগরীভুক্ত হ'যে গেছি। ভাবলাম, এবার বুঝি লাইনে বার হ'তে পারবো। লাইনের হাতছানি তখনও আমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে সাড়া জাগায়।

কিন্তু তা হ'লো না। কথায় বলে, 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।' আমারও হ'লো ওই ঢেঁকির অবস্থা। সেই কেরাণীগিরি করার জন্যে হেড্ আপিসে ডাক পড়লো।

হেড্ আপিসে কাজ স্থুরু করলাম। কাজটা ট্রাফিক আপিসের সেই পুরানো ছক। বসতে হয় শুধু হেড্ আপিসে। এরই ফাঁকে ফাঁকে সার্জেণ্ট পীটার্সের টুকিটাকি কাজও ক'রে দিতে হয়। তখন আমি তাঁরই অধীনস্থ। সার্জেণ্ট পীটার্স হ'লেন অফিস স্থপারিনটেণ্ডেণ্ট।

দেখলাম, টেরী সাহেবের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নিয়ে হেড্ আপিসের অনেকেরই বেশ খানিকটা মাথা ব্যথা ছিল। তাই যখন হেড্ আপিসে বহাল হ'লাম, তখন এক মোহিন্ত ছাড়া প্রায় আর সকলেই আমাকে ঠাট্টা করতে সুরু করলে, কি হে বোস, টেরী সাহেবের জন্যে মন কেমন করছে নাকি!

একদিন মজুমদার মশাই আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, লেফটেনাণ্ট টেরীর চিঠি এসেছে তার নতুন কোম্পানি থেকে। আমি ঠিকানা দেব'খন, তুমি লিখে দাও তোমাকে তার নতুন কোম্পানিতে রিকুইজিসন ক'রে নিয়ে যেতে।

সবিস্ময়ে মজুমদার মশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম। কিন্তু বিস্ময়ের মাত্রা আমার বেড়েই গিয়েছিল, যখন দেখলাম মজুমদার মশাই যা বলছেন, সেটা আমার প্রতি বিদ্রূপ নয়।

প্রথম প্রথম খোঁচাগুলো একটু যেন গায়ে লাগতো। পরে যখন বুঝলাম, এই উক্তিগুলো নিছক কেরাণী মনের অভিব্যক্তি, তখন আর বিরক্ত হইনি। লেফটেনাণ্ট টেরীর অপসারণে আত্মীয় বিচ্ছেদের ব্যথা আমি কোন দিনই অনুভব করিনি। কিন্তু ব্যথা যখন পেতাম অন্য অফিসারদের ব্যবহারে, তখন অনিবার্যভাবেই লেফটেনাণ্ট টেরীর কথা মনে পড়তো।

একমাত্র মোহিন্তই অন্যদের বাধা দেওয়ার চেস্টা করতো। হয়তো আমার ওপর তার কিছুটা সহানুভূতি জন্মেছিল।

আমি মিশুক নই, কাজেই একা একা থাকি। মনমরা সব সময়েই, কারণ উল্লসিত হওয়ার মতো কোন খোরাক সামনে ছিল না।

তাই অবসর সময়ে চিঠি লিখি। বড় বড় চিঠি—পাতার পর পাতা। লিখে যেন আর শেষ করতে পারি না। আমার এক বোন লিখেছিল, তোমার চিঠিগুলো পড়লে ভয়ানক কান্না পায়। না কেঁদে তোমার একখানা চিঠিও শেষ করতে পারি না।

কি করবো! কান্না যে অহরহ আমারও পেতো। আমার জীবনে কি স্বপ্ন ছিল, তাইতো আমি সঠিকভাবে জানতাম না। মানুষকে বড় ভালোবাসতাম। মানুষের একটা সুন্দর ছবি মনের মধ্যে আঁকা ছিল। অপরিণত মনের সেই অপটু ছবি যে বারে বারে বিকৃত হ'য়ে যেতো!

মনটা ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠতো। চারিদিকে উচ্ছৃঙ্খলতার বান ডেকে চলেছে। মানুষগুলো যেন মরিয়া হ'য়ে নিজের জীবনকে বিকৃত বিভৎস ক'রে তোলার পণ নিয়েছে! সবিস্ময়ে দেখতাম, মদ খাওয়া—ওটা যেন একটা রেওয়াজ! শুধুই মাতাল হওয়ার জন্যে মদ খাওয়া!

জিজ্ঞেস করেছি, শুধু শুধু মদ খাচ্ছ কেন?

উত্তর পেয়েছি, মিলিটারীতে ঢুকেছি, মদ খাবো না!

এমনতর সরল মানুষগুলোর জন্যে মনে মনে অনেক কষ্ট পেয়েছি। আর কষ্ট পেয়েছি এই উচ্চাভিলাষী মানুষগুলোর জন্যে, যারা নিজে বড় হওয়ার জন্যে কর্তৃপক্ষের গোলামে পরিণত হয়েছে। কি কাঙালপনা তাদের সমস্ত সত্তায়, সাহেবের একটু পিঠ চাপড়ানি পাওয়ার জন্যে। বেচারীরা ভাবতেও পারে না যে ওই সাহেবেরা চিরদিন তাদের মাথার ওপর থাকবে না।

মোহিন্তই প্রথম মানুষ যে নাকি আমার সঙ্গে মেশার ফলে মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। হেড আপিস মহলে এই কথাটাই শাখাপল্লব বিস্তৃত ক'রে র'টে গিয়েছিল।

এই ঘটনার পরিণতি হিসাবে কয়েকজনের কাছে আমি চক্ষুশূল হ'য়ে উঠলাম। সার্জেণ্ট পীটার্স, প্রৌঢ় মজুমদার মশাইতো রীতিমত খাপ্পা হ'য়ে উঠলেন। মদের ফাণ্ডে মোহিন্তর মাইনের প্রায় সব টাকাটাই জমা পড়ছিল। সেই বৃহৎ অঙ্কটা হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে যাওয়ায়, তাঁদের সমস্ত রাগটা এসে পড়লো আমার ওপরেই।

যেন আমি কোন মিশনের বাবাজী—মোহিন্তকে সম্মোহিত ক'রে নিজের দলে ভিড়িয়েছি!

হেড কোয়ার্টারস স্টাফ টেন্টের আলাদা ব্যবস্থা। সেখানে নিয়মানুবর্তিতার ঝাঁঝ একটু কম। হেড আপিসের স্টাফ হওয়ার ফলে সেখানে স্থান পাওয়া আমার আইনসম্মত অধিকার। কিন্তু সার্জেণ্ট পীটার্স আইনগত আপত্তি তুললেন। হেড আপিসে কাজ করা সত্ত্বেও ক্যাটেগরীতে আমি গার্ড, কাজেই আমি পার্মানেণ্ট হেড কোয়ার্টারস স্টাফ হিসাবে গণ্য হ'তেই পারি না। যদিও সার্জেণ্ট পীটার্সও ক্যাটেগরীতে ক্লার্ক ন'ন।

সুতরাং সাধারণ টেণ্টে আমি র'য়ে গেলাম। সেখানে আমার বন্ধু কেউ না থাকলেও সুহৃদ ছিল অনেকে। আমি তাদের দরখাস্ত লিখে দিই। পে-বুক থেকে পাওনা-গণ্ডা হিসাব ক'রে দিই। তারা বুকভরা কৃতজ্ঞতা নিয়ে ফিরে যায়।

এরই ফাঁকে ফাঁকে মোহিন্ত আসে আমার তাবুতে। অনেকক্ষণ থাকে। ব'সে ব'সে নানান গল্প করে। আমার বড় ভালো লাগে। প্রায় আমারই সমবয়সী! ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে। নিবাস ওদের তেজপুর। সুন্দর একটি সংসার। বাবা মা দু'জনেই আছেন। ছোট একটি ভাই আর একটি বোনও আছে। আর থাকেন ওদেরই সংসারে ওর এক বিধবা মাসিমা আর তাঁর একটি মেয়ে।

মোহিন্ত মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছে বাড়ীতে লুকিয়ে। পরে নাকি লোকপরম্পরায় বাড়ীর লোক জানতে পেরেছে। বাড়ী থেকে প্রায়ই চিঠি আসে। ও তার একটারও উত্তর দিতো না। ওর বাবা আর কোন উপায় না দেখে কোম্পানিতে চিঠি দেন। মেজর চৌধুরীর হাতে পড়ে সেই চিঠি। তিনি ওকে খুব ধমকে দেন, এবং হুকুম দেন সপ্তাহে অন্ততঃ একখানা ক'রে চিঠি লিখতে। তাই সে প্রতি সপ্তাহের সোমবারে মেজর চৌধুরীর হুকুম মোতাবেক

একখানা ক'রে চিঠি দেয় নিজের কুশল সংবাদ দিয়ে এবং মা, বাবাকে প্রণাম জানিয়ে।

এতো সব খবর হঠাৎই একদিন জানতে পারলাম অদ্ভুত ভাবে।

সেদিন, আমি তখন চিঠি লিখছি আমার তাঁবুর মাচায় শুয়ে। মোহিন্তু আমার তাঁবুতে এলো। সম্ভবত খানিকটা সময় কাটাতে। তখন ডিমাই এক-চতুর্থাংশ সাইজের লেটার প্যাডের চারখানা পাতা লেখা হ'য়ে গেছে, পঞ্চমখানা সবেমাত্র সুরু করেছি।

মোহিন্তু মাচার ওপর আমার পাশেই ব'সে পড়লো। লেখা হ'য়ে যাওয়া পাতা চারখানা দেখে সে একেবারে লাফিয়ে উঠলো, ওরে বাপস্! এই কি আপনার চিঠি লেখা নাকি!

উপুড় হ'য়ে শুয়ে লিখছিলাম। উঠে বসতে বসতে বললাম, এই নিয়েই তো এখানে টি'কে আছি।

মোহিন্তু আবার ব'সে পড়লো। তখনও সে রহস্যমুখর। পাতা চারখানা তুলে নিয়ে বললে, এই ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর দিয়ে চারখানা পাতা ভরিয়ে ফেলেছেন। তাতেও হয়নি! আরও লিখছেন! আর ক'পাতা লিখবেন?

হেসে বললাম, আর হয়তো এক লাইনও লিখবো না। এইখানেই ইতি টেনে দেবো। এইবার আপনার সঙ্গে গল্প করবো।

মোহিন্তু বিস্মিত স্বরে বললে, তার মানে!

বললাম, তার মানে, আমার এই চিঠি লেখা হ'লো নিজের সঙ্গে কথা বলা। প্রায় সারাটা দিন চুপচাপ থাকি ব'লে মনটাও তো আর চুপ ক'রে থাকে না। সারাদিন ধ'রে অনর্গল আমার কানে কানে কথা ব'লে চলে। সেই কথাগুলোই আমি চিঠির কাগজের ওপর ছড়িয়ে দিই। যাদের কাছে লিখি, তারা আমার শ্রোতা। প'ড়ে দেখুন না, কি লিখেছি।

মোহিন্ত সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়লো। বললে, না না, আপনার চিঠি আমি পড়বো কেন!

আমি বললাম, আমার তরফ থেকে কোন আপত্তি নেই।

পাতা ক'খানা গুছিয়ে নিয়ে মোহিন্ত পড়তে আরম্ভ করলো। পড়তে পড়তে এক সময়ে তন্ময় হ'য়ে গেছে! আমি মুগ্ধ নেত্রে দেখছি, আমারই লেখা প'ড়ে একজন মানুষ কেমন ক'রে সেই লেখার মধ্যে ডুবে গেছে!

পড়া শেষ ক'রে কাগজ ক'খানা আমার হাতে ফেরৎ দিয়ে মোহিন্ত নিশ্চুপ হ'য়ে ব'সে রইলো। মুখখানা তার থম্‌থম্‌ করছে। চোখের দৃষ্টি যেন বহুদূরে নিবদ্ধ। সে যেন তলিয়ে গেছে তার নিজেরই মনের অতলে।

চুপ ক'রে রইলাম আমিও। নিজেরই মনে হ'লো, কথা বলার সময় এটা নয়। চুপ ক'রে থাকলেই বুঝি অনেক বেশী কথা বলা হবে।

কিছুক্ষণ পরে মোহিন্ত বললে, চলুন একটু বাইরে ঘুরে আসি। আপনার কাছে কয়েকটা কথা বলবো। আপনিই ঠিক লোক, যে আমার কথাগুলো ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে। আমার বাবা পারেননি, আমার মা পারেননি, এমন কি 'সে'ও পারেনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়েছে, আপনি পারবেন।

যথারীতি রাহ্‌ধারী, অর্থাৎ ছাড়পত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে। চললাম গৌহাটির দিকে। ঠিক কোন নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল আমরা স্থির করিনি। একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, দু'জনে একসঙ্গে থাকা। অনেকক্ষণ, অন্তত ততক্ষণ, যতক্ষণ না ক্যাম্পে ফেরার সময় ব'য়ে যায়।

বার হওয়ার মুখে মোহিন্ত বললে, এই যে আপনার সঙ্গে বেরোলাম, এই নিয়ে কিন্তু তুমুল কাণ্ড হবে।

সবেমাত্র ক্যাম্পের গেট ছেড়ে রাস্তায় পড়েছি। মোহিন্তর কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বললাম, কেন! আজ কি আপনাদের কোন প্রোগ্রাম ছিল?

মোহিন্ত বললে, প্রোগ্রাম! ঠিকই ধরেছেন। আজকের যা প্রোগ্রাম, সে অতি মারাত্মক। হোল্ নাইট প্রোগ্রাম। ব্যবস্থাও সমস্ত হ'য়ে গেছে। গৌহাটিরই এক সিভিলিয়ান কোয়ার্টারে সারা রাত্রি মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে ফূর্তি।

আমি দাঁড়িয়েই ছিলাম। বিমূঢ় দৃষ্টিতে মোহিন্তর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, তাহ'লে—

মোহিন্ত একটা ঠেলা দিয়ে আমাকে চলতে ইঙ্গিত ক'রে বললে, সেই কথাটা বলবো ব'লেই তো আপনার সঙ্গে বার হ'লাম।

চলতে সুরু করেছি। তবুও মনে হচ্ছে, পা দু'টো যেন চলতে চাইছে না। দ্বিধায় বার বার কেমন যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। ঠিক এই জাতীয় একটা ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে মন চাইছিল না।

মনে মনে চেয়েছিলাম, মোহিন্ত মদ খাওয়া ছেড়ে দিক। কিন্তু তার জন্যে এতখানি নাটকীয়তার কিইবা এমন প্রয়োজন!

মোহিন্তকে যখন ক্যাম্পে পাবে না, তখন নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি প'ড়ে যাবে। তারপর যখন সন্ধান মিলবে যে আমার সঙ্গে বেড়াতে গেছে, তখন প্রথম পর্বে আসবে বিস্ময় আর শেষ পরিণতিতো উষ্মা। সে উষ্মার খোরাক যে আমিই হ'য়ে দাঁড়াবো, এটা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হচ্ছে না।

কিন্তু বিপদ বাধিয়েছে মোহিন্ত। কেমন ক'রে তাকে ওই মায়ফেল্'এ যেতে বলবো, যখন সে নিজেকে সামলাবার জন্যে আমারই সান্নিধ্যের আশ্রয় নিয়েছে।

এতক্ষণ চুপচাপ চলেছিলাম। হঠাৎ মোহিন্ত কথা ব'লে উঠলো, একটা কথা বললে আপনি বিশ্বাস করবেন?

কেন করবো না! আমি উত্তর দিলাম।

মোহিন্তু বললে, মিলীটারীতে ভর্তি হয়েছি, এই একবছর হ'লো। এর মধ্যে বোধ হয় একটা মাস বাদ গেছে। তার পর থেকেই মদ ধরেছি। এখন তো আমি পাঁড় মাতাল। কিন্তু এই মদ খাওয়া বা তার আনুষঙ্গিক, কোনটাই আমার সত্যিই ভালো লাগে না। তবুও কেন যে মদ খাই বা বেশ্যাবাড়ী যাই, কিছুতেই বুঝতে পারি না।

দুরূহ প্রশ্ন! তবুও একটা সূত্রের খোঁজ যেন পাওয়া যাচ্ছে। মনের খোরাকের অভাব। জীবনের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হওয়ার ঘূর্ণীপাক। মনকে সুস্থ রাখার মতো খোরাকের জোগান দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই তো মিলিটারীতে নেই। স্নেহ, মায়া, ভালোবাসা, দায়-দায়িত্ব বর্জ্জিত এই যে এক অস্বাভাবিক জীবন, এই জীবন একটা সুস্থ মানুষ কী অবলম্বন ক'রে কাটাবে!

মোহিন্তর মুখের দিকে তাকালাম। সে মুখখানা যেন উদ্গত কান্নায় থমথমে এক শিশুর মুখ। সাধারণত তাকে যা দেখি, দাম্ভিক, বেপরোয়া, উন্নাসিক—সে মানুষটা কোথায় যেন উবে গেছে।

বললাম, আপনার কথা আমি পুরোপুরিই বিশ্বাস করি।

সম্ভবত আমার সহানুভূতি বিগলিত স্বর তাকে ধাক্কা দিয়েছে। হঠাৎ সে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, কি ক'রে বিশ্বাস করলেন? যে মানুষটা কাজে করছে এক, আর মুখে বলছে আর এক—তাকে কেমন ক'রে বিশ্বাস করা যায়।

মোহিন্তর ঝাঁঝালো স্বরে আমার আবেগও মাঝপথে রুখে গেল। বললাম, যায় মোহিন্তবাবু, যায়। বিশ্বাস করা যায় অনুভূতিশীল মন দিয়ে, বিচারকের মেজাজ নিয়ে নয়। আমি তো আগেই বলেছি, আমি আপনার বিচারক নই। আমি আপনাকে জানতে চাই। আপনার ভেতর বুদ্ধিদীপ্ত তেজস্বী একটা চরিত্র আছে, সেই

চরিত্রটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'তে চাই। কাজেই আপনার কথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে মোটেই দুরূহ নয়।

ক্যাম্পের গা বেয়ে কাঁচা রাস্তা পার হ'য়ে সদর রাস্তায় এসে পড়েছি। পাণ্ডু বাজার ষ্টেশনেরই সংলগ্ন। কোম্পানির কিছু কিছু ছেলে ওখানে ঘোরাফেরা করছে, জিনিষপত্র কিনছে, খাবারের দোকানে ব'সে মুখ বদলাচ্ছে।

আমরা গৌহাটির রাস্তা ধরলাম। পীচ ঢালা রাস্তা। মাইল খানেক হেঁটে গেলেই গৌহাটি। কয়েক পা চলার পর দু'জনে কদম মিলিয়ে নিলাম। পায়ের তাল না মিললে দু'জন সৈনিক পাশাপাশি চলতে পারে না।

বাজার ছাড়িয়ে বাঁয়ে কামখ্যা পাহাড়, ডাইনে রেল লাইন। প্রায় মাইলটাক রাস্তার দু'ধারে কোন বসতি নেই। আশ্চর্য নির্জ্জন রাস্তাটা। থেকে থেকে কেবল এক-আধটা মিলিটারী ট্রাক সবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আমরা চলছিলাম চুপচাপ। কথা বলার মতো তেমন কিছু যেন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এটিকেট্ দুরস্ত কথাবার্তা আবহাওয়া সংবাদ দিয়ে সুরু করা যেতো। কিন্তু অপেক্ষা করছিলাম মোহিন্তর জন্য। ও-ই আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে কথা বলার জন্যে! এমন কথা, যা ওর বাবা, মা, এমন কি 'সে'ও বুঝতে পারেনি। ওর সেই কথা, ও আশা করে, আমি বুঝতে পারবো!

আমার প্রতীক্ষা বিফল হয়নি। মোহিন্ত সুরু করেছিল অনেক সঙ্কোচ, অনেক দ্বিধা নিয়ে। এক সময়ে সে সঙ্কোচ, সে দ্বিধা কেটে গেছে। গলার স্বর পরিষ্কার হ'য়ে উঠেছে। পরিশেষে সে স্বর ক্ষোভে, অভিমানে ভেঙে পড়েছে।

পরিশিষ্টে বলেছে, তাই আজ আমি এই। যা আপনি দেখছেন, আসলে আমি তা নই। কিন্তু আমার জীবনের সমস্ত স্বপ্ন যদি ব্যর্থ

হ'য়ে যায়, তাহ'লে আর বেঁচে থেকে লাভ কি? প্রথমে আত্মহত্যাই করতে চেয়েছিলাম। পরে মনে হয়েছিল, কাজটা অতি নীচ। তাই আত্মহত্যা না ক'রে মিলিটারীতে ঢুকেছি। জানি, মৃত্যুতো এখানে অবধারিত।

মোহিন্তর ঘটনা, সেই চিরন্তন ঘটনা। একটি ছেলে আর একটি মেয়ের ঘটনা। তারা জেনেছে, একে অপরকে ছেড়ে অসম্পূর্ণ। তাই তারা মিলতে চেয়েছে: সর্বাঙ্গীন মিলন। একে অপরের মধ্যে বিলীন হ'য়ে যাবে, এই তাদের সাধ! নতুন ক'রে নীড় রচনা করবে। সৃষ্টি করবে নতুন এক জগৎ।

ছেলেটি মোহিন্ত। আর মেয়েটি ওর বিধবা মাসিমার মেয়ে। সম্পর্কে মাসতুতো বোন।

সমাজ আর মানুষের মধ্যে নিত্যকালের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হ'লো। সমাজ আগে, না মানুষ আগে? সেই সনাতন প্রশ্ন।

মোহিন্তর বাবা, মা আর গুরুজনেরা বিধান দিলেন, সমাজ আগে।

মোহিন্ত দাবি করলো, মানুষই সর্বাগ্রগণ্য—মানুষের জন্যেই সমাজ। আর সেই অনুগৃহিতা, আশ্রিতা মেয়েটিকে নবতর সমাজ গ'ড়ে তোলার মহাযজ্ঞে তন্ত্রধারক হ'তে আহ্বান জানালে।

কিন্তু অসহায়তার নিগড় বাঁধা তার চরণে। সে বিদ্রোহিনী হ'লে তার মায়ের কি হবে! মোহিন্ত তাঁর জন্যও যথাযোগ্য স্থানের আশ্বাস দিয়েছিল।

কিন্তু ভাঙ্গা-গড়ার এই নির্মম খেলায় মেতে ওঠার মতো মেরুদণ্ড কই! মেয়ে হিসেবে 'সে' বিবাহযোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ। কিন্তু মানুষ হিসাবে তার তো কোন ব্যক্তিসত্তা নেই এই সমাজের দরবারে। মেয়ে হিসাবে সংসারের ঘানি চোখ-বাঁধা বলদের মতো টানা যায়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মানুষ ছাড়া নতুন সমাজ গ'ড়ে তুলবে কে!

মোহিন্তর জীবন অন্ধকার হ'য়ে গেল। বেঁচে থাকার কোন

সার্থকতা সে খুঁজে পেল না। বাবার কারবারে যে দেখাশুনার কাজ সে করছিল, সেখান থেকেই কিছু টাকা আত্মসাৎ ক'রে চ'লে এলো কলকাতায়।

মিলিটারী বিভাগের দশ-দরজা তখন খোলা। বীর অভিমন্যুর মতোই পেছন পানে না তাকিয়ে এই চক্রব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

মনের মধ্যে তার প্রচণ্ড আক্রোশ সারা দুনিয়ার ওপর। যা কিছু সুন্দর, শোভন, সমীচীন—তারই বিরুদ্ধে বর্বর প্রতিহিংসা। সেই প্রতিহিংসার আগুনে সে যেন তুষানলে দগ্ধ হয়।

খবর-কাগজের পাতায় নিখোঁজ কলমে পড়ে, 'বাবা মোহিন্ত ফিরে আয়। আর দু'দিনের মধ্যে তোকে দেখতে না পেলে নিশ্চয়ই ম'রে যাবো'—ইতি তোর মা।

মোহিন্ত রোজই একখানা ক'রে কাগজ কেনে নিখোঁজ-কলমের ওই তিনটি লাইন পড়বার জন্যে। পড়ে বারম্বার, পঞ্চাশ বার, একশো বার, হাজার বার। মায়ের কণ্ঠস্বর অনাহত রবে তার কানের গোড়ায় কেঁদে কেঁদে বেড়ায়।

কিন্তু আক্রোশ তার শান্ত হয় না। জীবনের প্রতিশ্রুতি তো ওই বিজ্ঞাপনের মধ্যে নেই!

তিনদিন পরে বিজ্ঞাপন বন্ধ হ'য়ে গেল। প্রথমটা সন্দেহ জেগেছে, মা কি সত্যিই ম'রে গেল!

নিজেকে দেখে বুঝেছে, না মরেননি। মানুষের মৃত্যু অত সহজে হয় না। মা যদি এইটুকু শোকে মারা যেতেন, তাহ'লে এখনও বেঁচে থাকার মতো কোন যুক্তিই তার ক্ষেত্রে নেই। সে তার দয়িতাকে হারিয়েছে। মাকে হারিয়েছে। বাবাকে হারিয়েছে। হারিয়েছে ছোট ভাই-বোনগুলিকে। আরও হারিয়েছে তার স্নেহের নীড়, শান্তির গৃহ।

তবু তো সে বুক চাপড়ে কাঁদতে পারে না। তার মনের ব্যথা

কারও কাছে প্রকাশ করতে পারে না। তার নিঃস্বতা অপরিসীম, অপরিমেয়—তার বাবা, মা'র চেয়ে হাজার গুণ বেশী।

তাঁরা যখন প্রিয় সন্তানের বিচ্ছেদে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেন, অপত্য স্নেহে বিগলিত অশ্রুধারায় মনের ব্যথা লাঘব করেন—তখন সে প্যারেড্ করে লেফ্ট্-রাইট-লেফ্ট্। অন্যমনস্কতার জন্য যখন পায়ের তালে ভুল হ'য়ে যায়, তখন হাবিলদারের কর্কশ হুকুমে তার সম্বিৎ ফিরে আসে। তার জগতে আর কিছুই নেই, শুধুই লেফ্ট্-রাইট্-লেফ্ট্!

জীবনের জন্যে আকণ্ঠ পিপসায় বুক শুকিয়ে ওঠে। দয়িতাকে বাহু যুগলের বাঁধনে পাওয়ার জন্যে বুকের স্পন্দন উদ্দাম হ'য়ে ওঠে। ওষ্ঠপুটে যে অমৃতের আস্বাদ তখনও লেগে ছিল, তারই রোমন্থন ক'রে হৃদয় মন বিকৃত হ'য়ে ওঠে।

ব্যর্থতা! জীবনভরা শুধুই ব্যর্থতা। বুঝিবা ব্যর্থতাই তার জীবন।

এমন সময়ে সার্জেন্ট পীটার্স তার ওষ্ঠপুটে তুলে ধরলো প্রমত্ত সুরা।

বুক জ্বলে গেল! জ্বলে উঠলো বুঝিবা সমস্ত জীবনটা। সে দহন আজও শেষ হয়নি! সে লেলিহান শিখার যেমন চোখ ধাঁধানো রূপ আছে, তেমনই আছে তার অগ্নিস্রাবী জিহ্বার লেহন জ্বালা! সব বুঝি জ্বলে যায়! যে আগুন একদিন স্বেচ্ছায় জ্বালিয়ে তুলেচে—তাতেই বুঝিবা সব পুড়ে ছারখার হ'য়ে যায়!

মোহিন্তর সর্বশেষ কথা, এমন তো আমি চাইনি বোস!

উনিশে ডিসেম্বর কলকাতায় বোমা পড়লো।

ভারতের ধ্যানমগ্ন অচলায়তনের পাদপীঠ প্রকম্পিত ক'রে ভগবান তথাগতের আশীর্বাদলব্ধ ভক্তজনের বুদ্ধ-জন্মভূমির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ।

তাই বুঝিবা বোমাগুলো ছিল অত্যন্ত নিরিহ, যেন কিছুটা বন্ধু ভাবাপন্ন। কারও কারও মতে ওই বোমা বর্ষণ ছিল আসন্ন বড়দিনের প্রাক্কালিন ঘোষণা। অহিংসা মন্ত্রের দুই উদ্গাতা বুদ্ধ ও যীশুর ভক্তদলের মধ্যে ধর্মসংলাপের পূর্ব সংকেত!

তারপর সশঙ্ক, সত্রাস সপ্তাহ যাপনের পর এলো বড়দিন।

আমরা আকাশের দিকে অনিমেষে চেয়ে থাকি। সেই 'উজ্জ্বল বৃহৎ তারকাটির' জন্যে নয়, জাপানী বোমারু বিমানের প্রত্যাশায়।

তবুও বড়দিন এসে পড়লো।

রণক্ষেত্রে বড়দিন।

বড়দিন উপলক্ষে কোম্পানির ছুটি। ছুটির প্রোগ্রাম পার্ট ওয়ান্ অর্ডার মারফৎ জানিয়ে দেওয়া হয় আগের দিন রোলকলে।

সকালে যারা গীর্জায় যেতে চায়, তারা ছুটি পাবে গৌহাটি যাওয়ার জন্যে। যাতায়াতের ব্যবস্থা কোম্পানি থেকেই করা হবে।

বেলা দশটায় ক্রিস্‌মাস উপহার বিতরণ। সমরাঙ্গনে যুদ্ধরত সৈনিকদের কথা যাঁরা ভুলে যাননি, সেই সব মহান ব্যক্তি ও মহৎ প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছে নানা উপহার।

বেলা এগারোটায় বীয়ার বিতরণ। প্রাপক একমাত্র তারাই, যারা নিজেরা পান করবে।

রাত্রে বড়াখানা, অর্থাৎ ভুরিভোজ।

আপিস একেবারে বন্ধ রাখা যায় না। তাই অক্রীশ্চান এবং বীয়ার পান-অনিচ্ছুক মোহিন্ত আর আমার ওপর ভার পড়লো আপিস খোলা রাখার। লোক নির্বাচন নাকি মোহিন্তই করেছিল সার্জেণ্ট পীটার্সের মতের বিরুদ্ধে।

আর বন্ধ রাখা যায় না রেলের চাকা। তাই ডিউটিতে যারা বহাল আছে, তাদের রেহাই নেই। কল্ বুক্ ঠিকই আসবে। এ, এস্ এম্'কে গিয়ে বসতেই হবে ব্লক ইন্‌স্ট্রুমেণ্টের সামনে। সিগন্যা-

লারকে টরে-টক্ক বাজিয়ে যেতেই হবে। পয়েন্টস্‌ম্যানকে ঝাণ্ডা তুলিয়ে শান্টিং ইঞ্জিনকে আগে-পিছে করাতেই হবে।

কাজেই, দিনের পরও রাতের ডিউটি আমার বজায়ই থাকলো। সে কথা স্মরণ ক'রে মোহিন্ত আমাকে সকালটা ছুটি দিয়েছিল।

বড়দিন মানে আনন্দময় পরিবেশ। আমরাও আনন্দিত হওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম।

বেলা দশটায় ফল্ ইন্ করলাম প্যারেড গ্রাউণ্ডে, অবশ্য প্যারেড করার জন্যে নয়, বা পূরা ইউনিফর্মেও নয়—ওইটুকুই তো আনন্দ।

থলি ভরা উপহার নিয়ে মেজর সাহেব সেজেছেন সান্টা ক্লজ। অন্যান্য অফিসাররা রঙিন কাগজের টুপি মাথায় দিয়ে উৎসবের বেশে সজ্জিত। লঘু তাঁদের পদক্ষেপ, লঘুতর তাঁদের গলায় স্বর:

সিঙ্গল্ লাইনে আমরা মেজর সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। পরম উল্লাসে তিনি ঝুলির ভেতর থেকে উপহার-প্যাকেট বার ক'রে, আমাদের হাতে হাতে দেন।

প্যাকেট খুলে কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হ'য়ে যাই। কয়েকটি লজেন্স আর টফি, একটি কারুকার্যখচিত রুমাল, আর একটি রঙিন কাগজের টুপি।

কেমন যেন মনে হয়, আমাদের সঙ্গে বুঝিবা রসিকতা করছে! ছেলেভুলানো লজেন্স আর টফি হাতে দিয়ে কারা যেন আমাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। কোন সৌখিন মহিলার সীবন চাতুর্য আমাদের মতো মৃত্যুপথযাত্রীর জীবনে কতখানি স্নেহের স্পর্শ জোগাবে! আর ওই রঙিন কাগজের টুপি, ওইটাই হয়তো সঠিক উপহার। দুনিয়া জোড়া এই সার্কাস প্রাঙ্গনে আমরা তো ক্লাউনের ভূমিকাই অভিনয় ক'রে চলেছি!

উপাসনায় যারা গিয়েছিল, তারা কোম্পানির ট্রাকে নির্দিষ্ট

সময়ের মধ্যেই ফিরে এলো। পার্ট ওয়ান্ অর্ডারে যে টাইম্ টেব্‌ল্ দেওয়া হয়েছিল, তার কোন ব্যতিক্রম ঘটলো না।

ঠিক বেলা এগারোটায় বীয়ার বিতরণের হুইস্‌ল বেজে উঠলো।

আবার সিঙ্গল্ লাইনে ফল্ ইন্।

এবার লাইনটা অনেকটা ছোট। বীয়ারের বরাদ্দ মাথাপিছু এক বোতল। সকলকেই ওই মাঠে ব'সেই খেতে হবে।

তবুও কি অপূর্ব কৌশলে অনেকগুলো বোতলই বেআইনীভাবে পাচার হ'য়ে গেল। যথাকালে দেখা গেল, তাঁবুতে তাঁবুতে চলেছে বোতলের স্মাগলিং!

বেলা বারোটা নাগাদ কোম্পানির আবহাওয়া জমজমাট হ'য়ে উঠলো। বেশ কয়েকজন রীতিমত মাতাল হ'য়ে প'ড়েছে। তাদের নিয়ে আনন্দ উপভোগ করছে, যারা ও রসে বঞ্চিত।

মাতাল দেখা কিছু নতুন জিনিষ নয়। সন্ধ্যের অন্ধকারে কোন একটা তাঁবুর মধ্যে এক-আধজন মাতাল হামেশাই দেখা যায়। কিন্তু নিত্যকার এই মাতালদের নিয়ে দুশ্চিন্তারই উদ্রেক হয়। কারণ, মদ খাওয়া বারণ না হ'লেও, মাতাল হওয়া অপরাধ।

তাই দিনদুপুরে মাতাল হওয়া এবং মাতালদের নিয়ে মজা করা বড়দিনের আনন্দেরই অংশ।

অফিসার আর বি, ও, আর'দের মধ্যেই এক সময় বড়দিন সীমাবদ্ধ হ'য়ে পড়লো। কোম্পানির বাকী দু'শো লোক কুতুহলি দর্শক।

বেলা আরও বাড়লে, মেজর সাহেব বীয়ারের প্যাকিং কেসের ডালা খুলে দিলেন। প্যারেডের মাঠে বীয়ারের বোতল গড়াগড়ি খেতে লাগলো।

বড়খানায় আমরা খুশী হয়েছিলাম। সত্যিই ভুরিভোজ।

এক সপ্তাহ ধ'রে জমিয়ে রাখা মাংসের র্যাশন, অর্থাৎ ছাগলগুলি

সেদিন কাটা হয়েছিল। কানাঘুষোয় শোনা গিয়েছিল, একটি ছাগলের পেট থেকে নাকি তিনটি বাচ্চা বেরিয়েছে!

প্রথম প্রথম একটু গুঞ্জন, নাক সিঁটকানো, মুখ বেঁকানো প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু যথাকালে, প্লেট আর মগ নিয়ে লঙ্গরখানার সামনে লাইন দেওয়ার সময়ে, ও ব্যাপারটার উল্লেখ করতে বড় একটা কা'কেও শোনা যায়নি।

হয়তো তার যুক্তিসঙ্গত একটা কারণ ইতিমধ্যে ঘ'টে গিয়েছিল। ক্ষুধা ছিল জঠরে, লোভ ছিল রসনায়, কিন্তু মন তখন উধাও হ'য়ে গেছে অফিসার্স মেস্'এর দিকে।

আমাদের ডাইনিং হল্ নামক চালাটার মধ্যে মাঝখানের দুই খুঁটিতে ঝুলছে দুটি হ্যারিকেন লণ্ঠন। কালি বিভূষিত চিমনিতে আলোর অর্ধেকটা রাহুগ্রস্ত। আর আমাদের মুখোমুখি প্যারেড গ্রাউণ্ডের অপর প্রান্তে অফিসার্স মেস'এ জ্বলছে গোটা তিনেক হ্যাজাক বাত্তি। মাঝখানে ব্যবধান মাত্র একশো গজ।

আমাদের মন প্রাণ হ'রে নিয়েছে ওই অফিসার্স মেস্। সেখানে বিচরণ করছে পাঁচটি মেম সাহেব—আমাদের কোম্পানির অফিসার পিছু একজন!

আধা-অন্ধকার আমাদের ডাইনিং হল্'এ ব'সে তাদের পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আঁটসাঁট সাদা ধবধবে নার্সের পোষাকে তাদের শরীরের রেখাগুলো উদ্ধত ভঙ্গিতে প্রকট।

সন্ধ্যে গড়িয়ে রাতের মোহনায় মিশেছে। সারাদিনের কর্মসূচী শেষ হয়েছে। অন্ধকারের অদৃশ্য গহ্বর হ'তে সরিসৃপেরা মুখ বাড়ায়। ঘরবাড়ী-ফেলে-আসা মানুষগুলোর মনের কন্দরে কারা যেন হানা দেয়। রক্তের কণায় কণায় লাগে উন্মত্ত দোলা। দাঁতে দাঁত চেপে তারা সাহেবদের ভুজবন্ধনে বেপথুমানা মেমসাহেবদের নরম নিষ্পিষ্ট দেহগুলোকে যেন অনুভব করতে থাকে।

রোল্‌কল শেষ হ'য়ে যায় যথা সময়ে। রিট্রিটের লগ্ন আসন্ন। মিলিটারী জীবনে এই বুঝিবা প্রথম দিন, যেদিন রিট্রিটের সময়কে অত্যন্ত অসময় ব'লে মনে হয়েছে। এই তো সবেমাত্র অফিসার্স মেস্‌'এ পান-আলাপন শেষ হয়েছে। এইবার সুরু হবে নাচ।

মেস-হাবিলদার গোমেস; বি, টি, কুক্‌ ল্যাজার আর মশালচি কোর্বান মিয়া টেবিল চেয়ার সরাতে সুরু করেছে। নাচের আসর সাজানো হচ্ছে। সাহেব-মেমরা জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে হ্যাজাকের প্রখর আলোর তলায়।

মাঠের মাঝে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ব'সে আছে ক্যাম্পে উপস্থিত বোধ হয় প্রতিটি লোক। সাহেব-মেমের নাচ দেখার সুযোগ ওই মানুষগুলোর জীবনে আর তো কখনও আসেনি!

যথাসময়ে রিট্রিটের হুইসিল পড়লো। ক্ষুব্ধ, উদ্রিক্ত, জ্বালাধরা মন নিয়ে যে যার তাঁবুতে ফিরে গেল।

শুধু নাইট পিকেটরা লাঠি হাতে নেমে পড়লো টহল দিতে তাঁবুর পাশ ঘেঁষে, প্যারেড গ্রাউণ্ডের সীমানা ধ'রে।

রাত তখন বারোটা। নাইট সিফটের লোকেরা চ'লে গেছে ডিউটিতে। ডে-সিফটের লোকেরা ফিরে এসেছে ডিউটি থেকে। এতক্ষণে আমার অবসর হ'লো। এইবার শুয়ে পড়বো। এরপর যারা আসবে, তারাই আমাকে ডেকে তুলবে।

হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে নাইট পিকেট আপিসের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

চমকে উঠে বললাম, কে! কে?

নাইট পিকেট আমার কাছ ঘেঁষে এসে বললে, আমি রফিক, বোসবাবু। ওই দেখুন না, মেজর সাহেব এক মেম সাহেবকে টানতে টানতে মাঠের মধ্যে নিয়ে এসেছে!

ডিসেম্বরের শীতের রাত। কুয়াসার আস্তরণে চাঁদের আলো

ঝিমোচ্ছে। তবুও মাঠের মধ্যে দেখা যায় দুটো পোষাক—একটা অলিভ গ্রীন প্যান্ট আর অন্যটা সাদা স্কার্ট।

তার পরের দৃশ্য অবর্ণনীয়।

হঠাৎ কেন জানি না আমার মনে পড়ে যায় ক্রুশবিদ্ধ যীশুর সেই অমর উক্তিটি—হে ঈশ্বর উহাদের ক্ষমা কর, কারণ উহারা জানে না, উহারা কি করিতেছে।

আবার এলো ঠাঁই বদলের পালা।

পাণ্ডু থেকে মনিপুর রোড। অর্থাৎ আরও এগিয়ে চলেছি। একেবারে বুঝিবা জাপানীদের মুখোমুখি।

মনিপুর রোড রেল স্টেশনের নাম। জায়গাটার নাম ডিমাপুর। আসামের ডিমাপুর থেকে একশো বত্রিশ মাইলের একটি রাস্তা নাগা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে মনিপুর রাজ্যের রাজধানি ইম্ফলে পৌচেছে। সেই রাস্তাটার নাম মনিপুর রোড। ইম্ফল থেকে চৌত্রিশ মাইল দূরে ভারত—বর্মা সীমান্ত। সেই সীমান্ত বরাবর জাপানী সৈন্যেরা ঘাঁটি গেড়ে ব'সে আছে।

স্থান বদলের সঙ্গে সঙ্গে সালটাও পাল্টে গিয়ে হ'লো উনিশশো তেতাল্লিশ। ভারত—বর্মা সীমান্ত তখন ঘটনার অভাবে ম্লান। তখন যুদ্ধের মোড় ঘুরছে স্তালিনগ্রাদে।

ডিমাপুরে এসে প্রথমে আমরা উঠেছি স্টেশন সংলগ্ন রেলওয়ে কোয়ার্টারগুলোয়। তারপর স্টেশন এলেকা ছেড়ে এক জঙ্গলের ধারে তাঁবু ফেলেছি। তারপর 'সেখানে গ'ড়ে উঠেছে বাঁশ আর খড়ের ব্যারাক।

স্থিতিশীলতার একটা আভাষ ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত কোম্পানিময়। কাজের ধরণধারণও গেল বদলে। আমিনগাঁওয়ে কাজ শিখেছিলাম

হাতে নাতে। পাণ্ডুতে সিভিলিয়ানদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিলাম কিছু কাল। কিন্তু মনিপুর রোড রেলহেড্'এ দায়িত্ব নিয়ে কাজে নামতে হ'লো।

কোম্পানি আপিসের আস্তানা হ'লো ষ্টেশনের আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমে। আপিসের চেহারাও গেল বদলে এখানে এসে।

মেজর বাইওয়াটার নতুন নীতি প্রবর্তন করলেন। যে যার ক্যাটেগরীতে কাজ করবে। সার্জেন্ট পীটার্স ছিলেন ষ্টেশন মাষ্টার। কিন্তু আপিসে ছিলেন মেজর চৌধুরীর দক্ষিণ হস্ত। সেই সুবাদেই এতোদিন ছিলেন কোম্পানি আপিসের সর্বেসর্বা। নতুন নীতি অনুসারে তিনি গেলেন লাইনে। মোহিন্ত হ'লো অফিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

বাইওয়াটারী নীতি তখন আমার ওপরও প্রযোজ্য। কারণ, তখন আমি আর ক্লার্ক নই, রেলওয়ে গার্ড।

বাল্যকাল থেকেই ট্রেণের ওই ব্রেক ভ্যান্টা আমার কাছে মহা রহস্যময়। গার্ড সাহেবের পোষাক, হাতের ঝাণ্ডা, মুখের হুইসিল—কি যেন এক অদৃশ্য আকর্ষণে টানতো। সেই গার্ডের কাজ নিজে হাতেনাতে করতে পাওয়ার সম্ভাবনায় পুলকিত হ'য়ে উঠেছিলাম। আরও খুশী হয়েছিলাম এই ভেবে যে, ক্যাম্প জীবনের বাইরে মাঝে মাঝে যেতে পারবো, দূর পাল্লার পাড়ি জমাতে পারবো, সর্বোপরি নিজের ইচ্ছামত একটু আধটু চলাফেরা করতে পারবো।

আমার এমন সাধে বাদ সাধলো মোহিন্ত। সার্জেণ্ট পীটার্স এবং আমি, দু'জন অভিজ্ঞ এবং দক্ষ কর্মীকে একই সঙ্গে ছেড়ে দিলে, তার পক্ষে আপিসের কাজ চালানো মুস্কিল হ'য়ে পড়বে।

মেজর বাইওয়াটার রাজী হ'য়ে গেলেন। সুতরাং আমি পুর্নমুষিকো ভবঃ।

মোহন্ত খুব খুশী। আমি একটু ম্রিয়মান। সার্জেণ্ট পীটার্স

ও আপিসের অন্য কয়েকজন সন্দেহ করলো, সমস্ত রদবদলের ব্যাপারটাই মোহিন্ত এবং আমার চক্রান্ত। এর স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি, মোহিন্ত মদ আর মেয়েমানুষ ছেড়ে নাকি আমার চেলা হয়েছে!

চক্রান্ত আমরা করিনি, এটা সত্য কথা। কিন্তু মোহিন্ত আমাকে ছেড়ে থাকতে চায় না। তখনও সে মনে এতোখানি বল সঞ্চয় করতে পারেনি, যে একা সার্জেন্ট পীটার্সের প্রভাব কাটিয়ে উঠবে।

কিন্তু আমার ধারণা মোহিন্তর এ ভয় অমূলক। আসলে মানুষটাই তখন একেবারে বদলে গেছে। 'বাড়ীতে নিয়মিত চিঠি লেখে। সকলকেই লেখে। অভিমান আর আক্রোশ ধুয়ে-মুছে গেছে। তার জায়গায় স্থান নিয়েছে দৃঢ় সঙ্কল্প। সেই অনুসারেই সে ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

এমনই সময়ে, মার্চের শেষে কিম্বা এপ্রিলের গোড়ায় মোহিন্ত মারা গেল। কোন কারণ ছিল না, তবুও মোহিন্ত মারা গেল। যে সময়ে সে বুক ভ'রে বাঁচার কামনা করছিল সেই সময়েই অকস্মাৎ মারা গেল।

কিছুদিন ধ'রে ছুটিতে যাওয়ার কথা ভাবছিল। প্রায় দেড় বছর হ'য়ে গেছে তার মিলিটারী জীবন, অর্থাৎ গৃহ-বিচ্ছেদ। ছুটা এর আগেও তার পাওনা হয়েছিল, টার্ণও এসেছিল। কিন্তু স্বেচ্ছায় সে ছুটী নেয়নি। ছুটা নেওয়ার মতো মনের অবস্থা তখন তার ছিল না।

এইবার ছুটী নেওয়ার মতো মন হ'য়েছিল। সে সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনাও করেছিল। নতুন ধারায় আপিসটা আর একটু চালু হ'য়ে গেলেই সে ছুটী নেবে। একুশ দিনের ওয়ার লিভ্। এমন কিছু বেশী দিন নয়। ও ক'টা দিন তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ওই ক'টা দিনের জন্যে আপিসের দায়িত্বটা আমাকে নিতে হবে। সানন্দে রাজী হয়েছিলাম।

এমন সময়েই একদিন লাঞ্চ-আওয়ারের পর আপিস যাওয়ার সময়ে মোহিন্তু আপিসে যেতে পারলো না। ওর জ্বর এসে গেছে।

আসানের ওই অঞ্চলটায় জ্বর হওয়াটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। তবুও সিক্ এন্, সি, ও, হাবিলদার ব্যানার্জিকে ডেকে দিলাম।

বেলা চারটের সময় আপিসে ব'সে খবর পেলাম, এ্যাম্বুলেন্স ভ্যান্ এসে মোহিন্তুকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। সে নাকি জ্বরে বেহুঁস হ'য়ে পড়েছিল।

পরদিন বেলা চারটের সময় হাসপাতালে গেলাম মোহিন্তুকে আনতে। তার শেষকৃত্য ক্যাম্পের এলেকার মধ্যেই সমাধা করা হবে।

শুনেছিলাম, মোহিন্তুর হয়েছিল সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া। ও রোগটা নাকি ওই অঞ্চলের বনেদী রোগ। চব্বিশ ঘণ্টা কাটে না। মস্তিষ্কের মধ্যেকার সমস্ত রক্তকোষ ফেটে যায়। দেখলাম, মোহিন্তুর মুখের কষ, চোখের কোল, নাক কানের গহ্বর দিয়ে তখনও তাজা রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে।

এই রোগেই নাকি গত বৎসরে একশো চল্লিশ রেলওয়ে অপারেটিং কোম্পানির অর্ধেক মানুষ উজাড় হ'য়ে গিয়েছিল। তাদেরই জায়গায় আমরা এসেছি। তারা এখন হেড কোয়ার্টারস্ জলন্ধরে। নতুন ক'রে আবার সেই কোম্পানি গ'ড়ে তোলা হচ্ছে।

মোহিন্তুর শেষকৃত্য সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল, যতখানি সম্ভব ওই মিলিটারী আওতায়।

কোম্পানি থেকে মোহিন্তুর অস্তিত্ব মুছে গেল। কোম্পানির নমিন্যাল্ রোল থেকে নামটা কেটে দেওয়া হ'লো। কোম্পানির স্ট্রেংথ'এ একজন ক্লার্ক ক'মে গেল। তার জন্যে রিকুইজিশন্

পাঠানো হ'লো হেড্ কোয়ার্টারসে। কোম্পানি আপিসে মোহিন্তর কাজগুলো আমিই করতে লাগলাম। আপিসের কাজে আর একজনকে নিয়ে এইচ, কিউ, ষ্টাফের সংখ্যা ঠিক রাখা হ'লো। সবই ঠিক একই ভাবে চলতে লাগলো।

এইচ, কিউ, ষ্টাফ টেণ্টে নতুন ক্লার্কটি মহা আনন্দে মোহিন্তর খাটিয়াটা দখল করলে। আনন্দ তার হওয়ারই কথা। এইচ, কিউ, ষ্টাফ্ মানে কোম্পানির আভিজাত সম্প্রদায়। তাদের পি, টি, প্যারেড্ করতে হয় না। তাদের কাজের টাইম্ টেবল্ অফিসারদের টাইমের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা।

মোহিন্তর জিনিষপত্র স্টোরে জমা হ'য়ে গেছে। মিলিটারী কীটস্‌গুলো ষ্টোরের খাতাতেই জমা পড়বে। তারপর আবার নতুন ভাবে ইস্যু হবে অন্য লোকের কাছে।

তার ব্যক্তিগত জিনিষগুলো এখান থেকে চ'লে যাবে হেড্ কোয়ার্টারসে। সেখান থেকে মোহিন্তর বাবার কাছে যাবে কালো বর্ডার দেওয়া সুদৃশ্য ছাপানো ফর্মে মিলিটারী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে শোকবার্তা। তাতে লেখা থাকবে—সৈনিকটি বীরত্বের সহিত কর্তব্যরত অবস্থায় সমরাঙ্গনে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। তাহার ধর্মীয় রীতি অনুসারে তাহার শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। এই বীর সৈনিকের মৃত্যুতে সামরিক কর্তৃপক্ষ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

এই শোকবার্তার সঙ্গে যাবে মোহিন্তর ব্যক্তিগত জিনিষগুলো। সেগুলো নাকি ওই শোকসন্তপ্ত মাতাপিতা পুত্রের স্মারক চিহ্ন হিসাবে রক্ষা করতে পারেন।

মৃত মোহিন্তর জন্যে যা কিছু করণীয়, সামরিক কর্তৃপক্ষ তার কোন ত্রুটীই রাখেননি। মোহিন্তর জন্যে কোম্পানির সকলেরই

সব কাজ শেষ হ'য়ে গেছে। আমারই নাকি তখনও আরও কিছু বাকী থেকে গিয়েছিল। সে খবর কিন্তু আমি যাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত জানতাম না।

ঠিক মনে নেই কতোদিন পরে, একদিন সকালে সুবেদার সাহেবের কোয়ার্টারে ডাক পড়লো। একটু বিস্মিত বোধ করেছিলাম। আপিসের কাজের ব্যাপারে তো সুবেদার সাহেবের কিছু করণীয় নেই।

সুবেদার সাহেবের কোয়ার্টারে দেখলাম, নাগরিক পোষাকে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটা ক্যাম্প টুলের ওপর ব'সে আছেন। আর সদা প্রফুল্ল সুবেদার সাহেব মুখখানা গোমড়া ক'রে বাইরের দিকে চেয়ে আছেন।

সামনাসামনি হ'তেই সুবেদার সাহেব ঝট্ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বোস, এই ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে ব'সে আছেন। তুমি এঁর সঙ্গে কথা বলো।

কথাটা বলতে বলতে সুবেদার সাহেব রাস্তায় নেমে পড়লেন এবং শেষ করার আগেই কোথায় যেন চ'লে গেলেন।

কোয়ার্টারের মধ্যে ঢুকে এক অপলক দৃষ্টির সামনে দাঁড়ালাম। সে দৃষ্টির সামনে কেমন যেন সঙ্কোচ লাগে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে রইলাম তাঁর কথা সুরু করার জন্যে। পরে যখন বুঝলাম, ভদ্রলোক প্রায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য, তখন আমিই কথার সূত্রপাত করলাম, আপনি কি আমাকে খুঁজছেন ?

ভদ্রলোক যেন ভয়ানক চমকে উঠলেন। হঠাৎ আমার হাত দুটো ধ'রে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব'সো বাবা ব'সো। কিছুক্ষণ আমার সামনে ব'সো। প্রাণ ভ'রে তোমাকে একটু দেখি। তোমার মধ্যে দিয়েই তাকে দেখতে পাবো।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, কেন সুবেদার সাহেব আমাকে এগিয়ে দিয়ে ওইভাবে চোরের মতো পালিয়ে গেলেন।

পরিস্থিতিটা খুবই মর্মান্তিক। কিন্তু আমার কাছে কেমন যেন একটু কৌতুকপ্রদও মনে হ'লো। আমি যেন মিড়িয়াম্। আমার মাধ্যমে ভদ্রলোক তাঁর গৃহত্যাগী, অভিমানী, মৃত পুত্র মোহিতকে দেখতে চান!

বেশ, তাই হোক। আমি ব'সে রইলাম কাঠের পুতুলের মতো। সময় ব'হে চলেছে মৌন মন্থর গতিতে! কিন্তু কতক্ষণ পারা যায়! নাটক অভিনয় করা আমার অভ্যাস নেই। আর নাটকীয়তা আমার ভালোও লাগে না।

বললাম, আপনার কি কথা ছিল, একটু তাড়াতাড়ি সেরে নিলে ভালো হ'তো। আমাকে আবার এখনই আপিসে যেতে হবে। হয়তো সাহেবরা খোঁজাখুঁজি করছে।

হয়তো আমার স্বরে একটু রূঢ়তা ফুটে উঠেছিল, হয়তো বা আমার মুখে চোখেও দেখা দিয়েছিল অস্বস্তির ছাপ। ভদ্রলোক আমার হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে সোজা হ'য়ে বসলেন।

আমার মুখের পানে আরও কিছুক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থেকে আমতা আমতা ক'রে বললেন, খোকার মা বললেন তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে। তোমার কথা খোকা ইদানিং বড্ড লিখতো। প্রত্যেক চিঠিতেই লিখতো। লিখতো, তোমার জন্যই নাকি সে নতুন ক'রে জীবন ফিরে পেয়েছে। তাই খোকার মা বললেন, তোমার কাছে জিজ্ঞেস করতে, খোকা তোমার কাছে আমাদের কথা কি কি বলতো। আমাদের ওপর তার বড্ড অভিমান হয়েছিল। কিন্তু আমাদের ওপর রাগ ক'রেই কি সে মারা গেল?

সহজ সুরেই বললাম, না না, আপনাদের ওপর রাগ ক'রে মারা যাবে কেন! অসুখেই সে মারা গেল। এমন অসুখ, যার কোন চিকিৎসা নেই। হাসপাতালের ডাক্তাররা সকলে এসে জড়ো

হয়েছিলেন ওর বিছানার পাশে। যা কিছু করার, তার কোন ত্রুটী তাঁরা করেননি। কিন্তু বাঁচানো গেল না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ।

ভদ্রলোক যেন সমস্ত শরীর মন দিয়ে আমার কথাগুলো গিললেন। তারপর সেই একই প্রশ্ন, তোমার কাছে খোকা আমাদের কথা—আমার আর ওর মায়ের কথা কিছু বলতো না? আমরাই তো ওকে ঘরছাড়া ক'রে এই মিলিটারীতে পাঠিয়েছিলাম।

ভদ্রলোকের শোকোচ্ছ্বাস থেকে একটা কথা যেন পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম। যে অন্যায় আচরণ তিনি তাঁর প্রভুত্ববোধ থেকে পুত্রের সঙ্গে করেছেন, সেই অন্যায়াচরণের জন্য বিবেকের দংশন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে এতদূর ছুটে এসেছেন। এখন তিনি আমার মুখ থেকে শুনতে চান তাঁর মনোমত কথা। তাই তাঁর সমস্ত কথার মধ্যে বারবার ওই একটা প্রশ্নই উঠে পড়ছে, মোহিন্ত তাঁদের সম্বন্ধে আমার কাছে কি কি বলেছিল!

মোহিন্তর কি অভিযোগ ছিল, সে কথা সেদিন তাঁকে বলতে পারিনি। বললে হয়তো ভালো হ'তো। ভবিষ্যৎ কালের জন্যে প্রভুত্ববোধের রাশ হয়তো বা একটু আলগা করতে পারতেন।

উনিশশো তেতাল্লিশ সালটা কেটে যায় ঢিমে তেতালে।

আসাম-বর্মা সীমান্ত একবারেই নিশ্চুপ। ঘটনার অভাবে উত্তেজনার খোরাক জোটে না। অথচ জাপান বর্মা-সীমান্তে ব'সে আছে শিকারী বেড়ালের মতো ওৎ পেতে।

আমাদের জল্পনা কল্পনার জালবোনা চলতে থাকে অবিরাম। মনটা কেমন যেন অভিমানী হ'য়ে ওঠে জাপানের ওপর।

ভরসার ষোল আনাই ন্যস্ত ছিল জার্মানির ওপর। সেই অজেয়

জার্মানি তখন গভীর গাড্ডায়। স্তালিনগ্রাদে সাড়ে তিনলক্ষ জার্মান সৈন্য ঘেরাও হ'য়ে গেছে। হিটলার অবতারকে বুঝিবা ওই রাশিয়ার মাটিতেই কবরে যেতে হয়! ইউরোপে যুদ্ধের রথ তখন মোড় ফিরছে।

মুসোলিনীর ওপর কোন দিনই ভরসা ছিল না। কারণ, মুসোলিনা সাহেবের ভারতে আসার প্রোগ্রাম কোন দিনই ছিল না। উত্তর আফ্রিকা নিয়ে তিনি ল্যাজে-গোবরে হ'য়ে আছেন।

আমরা যারা স্বাধীনতা প্রেমিক, প্রথমটায় সর্বস্ব পণ ক'রে বাজী ধরেছিলাম হিটলার অবতারের ওপর। তাঁর ব্লিৎসক্রিগের পুচ্ছছটায় আমরা মুগ্ধ, বিমোহিত। সারা পশ্চিম ইউরোপ দখল ক'রে যখন তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন রাশিয়াব দিকে, তখনই আমরা কল্কি অবতারের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেলাম।

কিন্তু আমাদের মতো সাধুজনদের পরিত্রাণের পথে কাঁটা দিলে কিনা রাশিয়ার চাষারা!

আমরা দমবার পাত্র নই। আমরা জানি, বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।

তাই দুনিয়াজোড়া মানুষের জীবন-মরণ সংগ্রাম থেকে মুখ ফিরিয়ে আমাদের সেই সীমাহীন বিশ্বাস নিয়ে মুখ ঘোরালাম পশ্চিম থেকে পূবে।

কল্কি অবতারকে আবির্ভূত হ'তেই হবে, এই নাকি আমাদের শাস্ত্রের বাণী—সুতরাং আমাদের বিশ্বাসও অবিচল সে বিষয়ে।

অতএব দিব্যদৃষ্টিতে দেখলাম, কল্কি অবতারের শুভ্রবর্ণ ক্যামোফ্লাজ ক'রে হয়েছে পীত। আর ট্যাকটিকসের খাতিরে পশ্চিম ছেড়ে পূবে হয়েছে তাঁর অবস্থান।

ভারতের মুক্তি, অর্থাৎ ভারতকে বৃটিশ কবল থেকে গ্রাসান্তর করার সম্বন্ধে সম্ভবত একটা বোঝাপড়া হয়েছিল এক্সিস পাওয়ার গুলোর

মধ্যে। জার্মানি ভারতে ঢুকবে পশ্চিম দিক দিয়ে, আর জাপান পূবের পথ ধ'রে। পরিকল্পনামত সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল। জার্মানি সারা ইউরোপ দখল ক'রে রাশিয়ার দক্ষিণ দিয়ে এগিয়ে আসতে চাইলো ভারতের অভিমুখে। জাপান তখন সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দখল ক'রে ব'সে আছে আসাম-বর্মা সীমান্তে।

আমরা আসামে পৌঁছে যে অবস্থা দেখেছি, তা'তে জাপানের এই ব'সে যাওয়া বিস্ময়কর। বৃটীশ সিংহ তখন ল্যাজ গুটিয়ে প্রাণ বাঁচানোর দায়ে অস্থির। সমস্ত আসামের মধ্যে কোথাও তখন বোধহয় একটা এ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট্‌ গান্‌ ছিল না। সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড। বর্মা ইভ্যাকুয়ীদের লাশে আসামের পথঘাট আকীর্ণ।

জাপান যদি তখন গরু তাড়ানোর মতো পেছন পেছন মুখে কেবল 'হ্যাট্‌-হ্যাট্‌' শব্দ ক'রে হেঁটে আসতো, তাহ'লে তাদের বাধা দেওয়ার মতো মনোবল বা অস্ত্রবল বা ঘাঁটি, কোনটাই সেদিন ছিল না বৃটীশ সরকারের।

কিন্তু ফ্যাসিস্ট আঁতাত্‌ তো সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি! তাই জাপান তখন অপেক্ষা করছিল, জার্মানি রাশিয়ায় কতখানি ঘায়েল হয় দেখার জন্যে। জার্মানি যদি সত্যিই ভারতে ঢুকতে পাবে, তাহ'লে তার ভাগতো বাঁধাই আছে। কিন্তু রাশিয়ায় যদি সাঙাত আটকে পড়ে, তাহ'লে সমস্ত ভারতবর্ষটাই তার করতলে।

জাপানের এই শিয়াল পণ্ডিতি চালের জন্যে উনিশশো তেতাল্লিশ সালের দিনগুলো আমাদের জীবনে পান্‌সে হ'য়ে উঠলো। বাইরে থেকে উত্তেজনা নেই, আর ভেতরে ক্ষুদে মাতব্বরদের দৌরাত্ম্য আমাদের হাড়ে পর্যন্ত জ্বালা ধরিয়ে দিলে।

এই সময়টাকে বলা চলতে পারে আমাদের মোহভঙ্গের যুগ। সৈনিক বলতে যে বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল, আত্মকেন্দ্রিক মানুষগুলোকে

বোঝাতো, সেই মানুষগুলো স্বীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে যেন বুঝতে পারছে, সব ক'টা মানুষই একই দিনে একসঙ্গে মরবে না। যে মৃত্যুকে অবধারিত জেনে মিলিটারীতে ঢুকেছিল, সেই মৃত্যুর মোহ ধীরে ধীরে স'রে গিয়ে বেঁচে থাকার প্রশ্নই বড় হ'য়ে দেখা দিতে লাগলো।

যুদ্ধের শেষ অঙ্ক তখনও বহুদূর। কাজেই মিলিটারী জীবনে বেঁচে থাকতে হবে আরও বহুদিন। আর বাঁচতে হ'লে মানুষের মতো বাঁচাটাই কাম্য। কিন্তু অত্যাচারে আর অবিচারে যে কর্তৃপক্ষ মানুষগুলোকে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে, স্বাভাবিক ভাবেই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে মনের আনাচে কানাচে।

তাই অলস, উত্তেজনাহীন এই দিনগুলো হ'য়ে উঠলো সংগঠন গ'ড়ে ওঠার দিন। এ সংগঠন এক বিচিত্র ধারার। কেউ গড়েনি, কেউ নেতৃত্ব দেয়নি। কোন সভা হয়নি, কোন গঠনতন্ত্র রচিত হয়নি। শুধুই অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি থেকে বিচিত্র এক চেতনা সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠতে থাকে সৈনিকদের মনে মনে।

ব্যক্তির সীমানা ছাড়িয়ে সমষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার মতো প্রথম ঘটনা ঘটলো এই রকমই একটা সময়ে। আর এমনই দুর্ভাগ্য যে, ঘটনাটা ঘটলো আমাকেই কেন্দ্র ক'রে।

তখন আমি কিছু কালের জন্যে লাইনে কাজ করছি। প্রথম পর্যায়ে করেছি গার্ডের কাজ। লামডিং, গৌহাটি, মারিয়ানি, তিনসুকিয়া পর্যন্ত আমার গতায়াত। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইয়ার্ড ফোরম্যানের কাজ। সেই কাজই তখন আমি করছি। সেদিন ছিল আমার ডবল্ অফ্।

ইতিমধ্যে মেজর বাইওয়াটার চ'লে গেছেন। এসেছেন নতুন কমাণ্ডিং অফিসার মেজর উইলসন্।

সান্ধ্য ভোজের সময়ে সেদিনকার অর্ডারলি অফিসার লেফটেনাণ্ট লীচ্ হঠাৎ এসে উদয় হলেন।

ডাইনিং হল্ তখন লোকে ভর্তি। সকলেই খাচ্ছে। খাচ্ছে সেই অপরূপ খানা। প্রায় সমান সমান ভাগে মেশানো ধান, কাঁকর আর চাল সিদ্ধ করা ভাত। আর তার অনুপান, ডাল-হোল্-এম্-কলাই এবং ডিহাইড্রেটেড বাঁধাকপির একটি ঘ্যাট্।

ডাল-হোল্-এম্-কলাই, অর্থাৎ গোটা মাসকলাই ডাল। এই ডালটির কবল থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই। সকাল্ বিকাল দু'বেলাই এই ডালটি রান্না হয়। কারণ, এই ডালটি পাঞ্জাবের অধিবাসীদের নাকি জাতীয় ডাল।

পাঞ্জাবের অধিবাসীদেব নিয়েই বৃটিশ ভারতীয় বাহিনী। এবারেব যুদ্ধে আমরা হঠাৎ রবাহুতের মতো ঢুকে পড়েছি। কাজেই, আমাদের জন্যে কর্তৃপক্ষের কোনই মাথাব্যথা নেই। মিলিটারী খানা বনিয়াদি নিয়মেই চলে। যদিও আমাদের কোম্পানির পাঁচশো লোকের মধ্যে পাঞ্জাবের অধিবাসীর সংখ্যা তখনও একশোয় পৌছায়নি। আবেদন নিবেদন, আর্জি দরখাস্ত, অনেক পেশ করা হয়েছে। কিন্তু রদবদলের কোন উপায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফৌজী শাস্ত্রেব কেতাবে ভারতীয় সৈনিকের খানার ফিরিস্তি নাকি ওই ভাবেই লেখা আছে!

এ হেন ডাল্-হোল্-এম্-কলাইয়ের পাক প্রণালীও বিচিত্র। জানিনা ওটা ফৌজী শাস্ত্রের অন্তর্গত কিনা। কিন্তু বিশেষ ওই প্রক্রিয়াটির প্রয়োগ বরাবরই দেখেছি আমাদের কোম্পানিতে।

আগের দিন রাতে ডালটি চড়িয়ে দেওয়া হয় সিদ্ধ করার জন্য। সারারাত ধ'রে ধীমে-আঁচে বিরাট এক কড়ায় সিদ্ধ হয়। পরদিন সকালে সেই কড়াটা নামিয়ে, তার সবুজ জল আর কিঞ্চিৎ ফুলে-ওঠা ডালগুলোকে করা হয় আলাদা। তারপর ওই আধসিদ্ধ

ডাল একটা কাঠের ডাবার মধ্যে ফেলে কাঠেরই একটা দুরমুস্ দিয়ে, বেশ কিছুক্ষণ পেটাই করা হয়। সেই দুরমুস্-করা ডাল আবার তার সবুজ জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে চড়ানো হবে উনানে। সেই ডালে ঢেলে দেবে একটিন্ কন্‌ডিমেণ্ট মিক্‌স্‌চার, অর্থাৎ সারা ভারতের লোক যতো রকম মশলা ব্যবহার করে, তারই গুঁড়োর একত্র সমাবেশ। তার ওপর ঢেলে দেবে একটিন ঘি-ভেজিটেব্‌ল্। কিছুক্ষণ ধ'রে ফুটবার পর ওই মসলা আর ঘিয়ে মিশে অপূর্ব এক মনোলোভা বর্ণের সৃষ্টি হবে। কিন্তু ডালটি তখন তিন স্তরে বিভক্ত। তলার স্তরে আধ-সিদ্ধ সেই ডাল, মাঝের স্তরে সেই সবুজ জল আর উপরের স্তরে তেল মশলার সেই মোগলাই বর্ণ!

অর্ডারলি অফিসারের নানাবিধ কর্তব্যের মধ্যে খানা-পরিদর্শন অন্যতম। লেফটেনাণ্ট লীচ্ বয়সে নবীন, স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল, কর্তব্যবোধেও অটল।

ডাইনিং হল্'এ ঢুকেই প্রশ্ন করেন, খানা কৈসা হ্যায় ?

এ প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তরই মিলিটারী কর্তৃপক্ষ আশা করেন। ভি, সি, ও'রা সেই উত্তরটাই ঠিক প্যারেড্ করিয়ে না হ'লেও, হাবে-ভাবে, আকারে-ইঙ্গিতে শিখিয়ে দেন।

প্রশ্নের প্রথম ধাক্কায় ছেলেরা চমকে উঠে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে অর্ডারলি অফিসারের মুখের দিকে।

লেফটেনাণ্ট লীচ্ অধৈর্য হ'য়ে ওঠেন। ধমকের সুরে বলেন, বোলো, খানা কৈসা হ্যায় ?

বৃহৎ এক ঢোঁক গিলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি উত্তর দেয়, আচ্ছা হ্যায় সাব্।

দায়সারা কাজ পছন্দ করেন না লীচ্ সাহেব। জনে জনে তিনি জিজ্ঞাসা করেন এবং উত্তরও আদায় ক'রে নেন।

এমনই ভাবে তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। অফিস

ষ্টাফ্ হিসেবে অন্যদের চেয়ে আমি হয়তো একটু বেশী পরিচিত। আমার সামনে উবু হ'য়ে ব'সে অন্তরঙ্গ স্বরে বললেন, বোস, ঠিক ক'রে বলো, খানা তোমার কেমন লাগছে ?

ইতস্ততঃ করেছিলাম এই জন্যে যে, উত্তর দেওয়াটা যদি এড়িয়ে যেতে পারি।

মুখ তুলে তাকাতে দেখলাম, আমার আশে পাশে যতো জন ব'সে আছে, তাদের প্রত্যেকের জোড়া জোড়া চোখ আমার ওপর নিবদ্ধ। তাদের সেই দৃষ্টি থেকে অনুভব করলাম, তারা আশা করছে, আমি সত্যি কথাটাই বলবো।

লীচ্ সাহেবের সঙ্গে মোকাবিলায় আমি পেছিয়ে যাবো না।

তবুও সাহস পাচ্ছিলাম না।

লেফটেনান্ট লীচ্ উত্তরের জন্যে তাগাদা দিলেন।

অবশেষে আমি সবিনয় নিবেদন করলাম, আমরা এই ধরণের খানা কেউই পছন্দ করিনা।

এইটুকুই বোধহয় যথেষ্ট ছিল। লীচ্ সাহেবের আত্মীয়তার খোলস্ এক মুহূর্তে খ'সে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ব্লাডি নিগার, বাষ্টার্ড ইণ্ডিয়ান্ সম্পর্কে বিশুদ্ধ বৃটিশ মনোভাব ব্যক্ত হ'য়ে পড়লো।

তিনি যা বললেন তার নির্গলিতার্থ, এর চেয়ে ভালো খানা যদি তোমরা বাড়ীতে খেতে পেতে, তাহ'লে আর মিলিটারীতে আসতে না।

কথাটা বড্ড গায়ে বিঁধেছিল। আমার পক্ষে ধৈর্য রাখা সম্ভব হয়নি। বলেছিলাম, এমন খানা যদি আমাদের দেশের ভিখারীকে দেওয়া হয়, সে-ও খাবে না।

মেজাজ হারিয়ে ফেললেন লীচ্ সাহেব। গলার পর্দা বেশ খানিকটা চড়লো। ডাইনিং হল্‌টার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। অনেকেই খাওয়া অর্ধসমাপ্ত রেখে গুটিগুটি নিরাপদতর স্থানে চ'লে গেল।

ভোজবাজির মতো কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ডাইনিং হল্ প্রায় ফাঁকা হ'য়ে গেল। কিন্তু আমার আশেপাশে তখনও রয়েছে কয়েকজন লোক; সংখ্যায় খুব বেশী না হ'লেও, তারা এ ব্যাপারের শেষ দেখে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত।

সুবেদার সাহেব পাশেই ছিলেন। লীচ্ সাহেব রাগত স্বরে তাঁর কাছে খানার নমুনা চাইলেন! তিনি নিজে চেখে দেখবেন।

সুবেদার সাহেবের ঘর থেকে ডিস্ এলো। স্বয়ং সুবেদার সাহেব স্বহস্তে লেফ্‌টেনান্ট সাহেবের জন্য খানা নিয়ে এলেন লঙ্গরখানার মধ্যে থেকে।

আশ্চর্য ক্ষমতা ইমারজেন্সি কমিশন পাওয়া বৃটিশ অফিসারের! একটু মুখ বিকৃত করেননি লীচ্ সাহেব। কয়েক গ্রাস খেয়ে বললেন, এ তো চমৎকার খানা! এমন খানা আমরাও খেতে পারি।

লীচ্ সাহেবের 'আমরা' অর্থে বৃটিশ অফিসাররা।

সুতরাং আমার মিথ্যাভাষণ প্রমানিত হ'য়ে গেল।

সুবেদার সাহেবকে তিনি হুকুম দিলেন, পরদিন সকালে আমাকে অর্ডারলি রুম'এ পেশ করতে। তিনি নিজে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করবেন ও,সি'র কাছে। (এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমি তখন আর হাবিলদার নই। ক্লার্কত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমার হাবিলদারীও চ'লে গেছে।)

বিজয়ীর দৃপ্তভঙ্গীতে লেফটেনান্ট লীচ্ ডাইনিং হল্ থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

আজকের কাজ যে রীতিমত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পেরেছেন তারই পরিতৃপ্তি তাঁর মুখে চোখে।

হাত ঘড়িটার দিকে একবার তাকালেন। সম্ভবত তাঁর একটু দেরী হ'য়ে গেছে। বাংলোতে (অফিসাররা পি, ডব্লিউ, ডি, বাংলোতে আস্তানা গেড়েছেন) সকলে হয়তো তাঁরই জন্যে অধীর ভাবে অপেক্ষা করছেন।

গোয়ানিজ কুক্ ম্যানুয়েল ল্যাজার, যার মিলিটারী পদবী হচ্ছে বি, টি, (বৃটীশ ট্রুপ্‌স্) কুক গ্রেড্ ওয়ান, যার মাইনে পঞ্চান্ন টাকা— হয়তো এতক্ষণে ডিনার্ সাজিয়ে লেফটেনাণ্ট সাহেবের পথ চেয়ে ব'সে আছে।

আমাদেরও কুক্ আছে।

সুধীর, লছমন, আরকান, ভগওয়ানা আর শ্রীত ....

সকলেই কুক্—আই, টি (ইণ্ডিয়ান ট্রুপ্‌স্)। এদের মাইনে পনেরো টাকা। এদের ক্ষেত্রে গ্রেডের প্রশ্নই ওঠে না! ইণ্ডিয়ানদের ডাল রুটী বানাবার জন্যে কুক্ নামটাই যথেষ্ট।

এদের সঙ্গে এসে যোগ দিল বীরবল সিং।

বীরবল সিং'এর আবির্ভাব মনিপুর রোড ষ্টেশনে, অর্থাৎ আমাদের ডিমাপুর ক্যাম্পে। তার শুভাগমনের তারিখটা মনে রাখা সম্ভব হয়নি। তবে, তখন আমি আপিসে। মেজর বাইওয়াটার তখন যাই-যাই করছেন।

সম্ভবত থ্রি-টোয়েন্টিনাইন্ আপ্ প্যাসেঞ্জারে বীরবল সিং এসেছিল। ট্রেণটা মনিপুর রোডে এসে পৌছায় সকাল সাড়ে ছ'টায়।

বেলা তখন প্রায় আটটা। আমরা সবেমাত্র আপিসে এসেছি।

এ হেন সময়ে বীরবল সিং দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সশব্দে তাল ঠুকে বিরাট এক সেলাম করলো।

সেলামের শব্দে চমকে উঠে আমরা সকলেই বাইরে তাকালাম। বীরবল সিং তখনও হাত নামায়নি। কাজেই সেলামটার দিক্ নির্ণয়ের প্রশ্ন দেখা দিল। বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গেল, সাড়ম্বর সেই সেলামটি কোন ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশে করা হয়নি। সে সেলাম আপিস নামক স্থানটির প্রতি, যেখানে অফিসাররা বিরাজ করেন।

আপিসঘরের দরজা থেকে অন্তত ছ'ফুট দূরে বীরবল সিং দাঁড়িয়ে আছে। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট এক শিখ। বয়েস ষাটের কম নয়—সত্তর, এমন কি পঁচাত্তরও হ'তে পারে। গালের চামড়া লোল্ হ'য়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি স্তিমিত। মিলিটারী পোষাকের মিলিটারীত্বটুকু লোপ ক'রে দিয়েছে অপূর্বভাবে, তার নিজস্ব স্বাভাবিকতা দিয়ে। কোন সৈনিককে অমনভাবে মিলিটারী পোষাক পরতে দেখলে, যে কোন অফিসারই মিলিটারী-হেন-সংস্থা থেকে তাকে তখনই বরখাস্ত ক'রে দিতে একটুও দ্বিধা করবেন না।

বীরবল সিং'এর প্রতিটি অনুকণা যেন ব'লে দিচ্ছে যে সত্যিই সে unlikely to become an efficient soldier!

সকলেই আমরা সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলাম। এইবার বুঝি বীরবল সিং'এর কপাল পুড়লো। সকলেরই মনে ভয়, এখনই বুঝি ও, সি এসে পড়েন।

কাজেই, বীরবল সিংকে আপিস এলেকার ত্রিসীমানা থেকে পত্রপাঠ বিদায় করার জন্যে এগিয়ে গেলেন মজুমদার মশাই। যেহেতু মজুমদার মশাইয়ের কাজ চিঠি রিসিভ্ এবং ডেস্‌প্যাচ্ করা, সেই সুবাদেই সম্ভবত তিনি বীরবল সিংকে রিসিভ্ এবং ডেস্‌প্যাচের কাজে অগ্রণী হ'লেন।

প্রচণ্ড এক ধমকের সুরে মজুমদার মশাই বীরবল সিংকে প্রশ্ন করলেন, ক্যা মাঙতা ইধর?

মজুমদার মশাইয়ের পাকা গোঁফজোড়ার ফাঁক থেকে ধমকের ওই স্বর শুনে কিন্তু বীরবল সিং'এর কোনই ভাববৈক্লব্য ঘটলো না! দু'পাটি হলদে হলদে দাঁত বার ক'রে অতি প্রসন্ন এক হাসি হাসলো সে। আর যে কথাগুলো সে বললে, তার অর্থ উদ্ধার করতে হ'লে ভাষাতত্ত্বে যে মাস্টার ডিগ্রীর আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তা আছে, মজুমদার মশাইয়ের মুখভাব দেখে আমরা সকলেই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম।

অবশেষে তার মুভমেণ্ট অর্ডার আর পে-বুক দেখে বোঝা গেল, বীরবল সিং একজন আই, টি, কুক্। আমাদের কোম্পানিতে পোষ্টেড্ হ'য়ে আসছে খাস্ হেড্ কোয়ার্টারস্ জলন্ধর থেকে।

মুভমেণ্ট অর্ডার আর তার পে-বুক আপিসে জমা রেখে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো সুবেদার সাহেবের কাছে।

সুলতান এযাবৎ চুপচাপ ছিল। এতক্ষণে মুখ খুললো, এইবার আমাদের দুঃখ ঘুচলো বোস, স্বয়ং দ্রৌপদী এলেন পাকশালের ভার নিতে।

কোম্পানি আপিসের অর্ডারলি সোহ্‌রাব্ ফিরে এলো বীরবল সিংকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে। কিন্তু হাসির দমকে সে আর দরজা ডিঙোতে পারছে না। দু'হাতে পেট চেপে ধরেছে।

মজুমদার মশাই ধমক দিলেন সোহ্‌রাব্‌কে, ওইভাবে হাসছিস, কোন সাহেব যদি এখন দেখতে পায়, নির্ঘাৎ তোকে কোয়ার্টার গার্ডে পুরে দেবে!

হাসির কারণ ব্যাখ্যা ক'রে সোহ্‌রাব্ যা বললে তার সারমর্ম যেটুকু হৃদয়ঙ্গম হ'লো তা হচ্ছে:

বীরবল সিংকে ওই রকম বুড়ো মানুষ দেখে সুবেদার সাহেব জিজ্ঞেস করেন, সে লঙ্গরখানার কাজ পারবে কিনা?

তার উত্তরে বীরবল সিং সুবেদার সাহেবকে পাল্টা প্রশ্ন করে, কেনই বা সে পারবে না। ক'টা পায়খানা সাফ্ করতে হবে?

সুবেদার সাহেব তো রেগেই আগুন, পায়খানা সাফ্ করার কথা বলে কিনা আই, টি, কুক্!

বেচারা বীরবল সিং। সে তখন সাশ্রুনেত্রে নিবেদন করে, সারা জীবন ধ'রে সে পায়খানাই সাফ্ করেছে। জাতিতে সে মেথর। এইটিই তার জন্মগত পেশা। তাই সে তার কাজ বুঝে নিতে চেয়েছিল।

সে তো জানে না, তার ভর্তি হওয়ার সময়ে সুইপারের প্রয়োজন ছিল না। চাহিদা ছিল আই, টি, কুক্'এর। কাজেই কলমের খোঁচায় তার জাতব্যবসা মাথায় উঠলো—সে হ'য়ে গেল কুক্।

আর হ'লোই বা কুক্—সে তো ভারতীয় সৈনিকদের জন্যে !

লেফটেনাণ্ট লীচের হুকুম মাফিক পরদিন সকালে আমার নামে চার্জ সীট তৈরী হ'লো।

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে ইণ্ডিয়ান আর্মি এ্যাক্টের ৩০ (ডি) ধারা মতে। ওই ধারায় আছে an act prejudicial to good order and military discipline.

আমার এ্যাক্ট, অর্থাৎ কার্যকলাপ দ্বারা আমি সেনাবাহিনীর মধ্যে মিথ্যা অসন্তোষ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছি।

লেফটেনাণ্ট লীচ অভিযোগকারী এবং তিনিই একমাত্র সাক্ষী।

সুতরাং আমার সাতদিন সশ্রম কারাদণ্ড হ'য়ে গেল।

মিলিটারী জীবনে এই আমার প্রথম কারাদণ্ড। এর পর মাঝে মাঝে এই মনোরম স্থানটিতে আমাকে হাওয়া-বদল করতে যেতে হয়েছে।

স্বেচ্ছায় যেতে চাইনি, তবুও যেতে হয়েছে। কর্তৃপক্ষের মুখোমুখি হ'য়ে যখনই মনে হয়েছে, আমিও একটা মানুষ—আমি যন্ত্র নই—তখনই বিরোধ চরমে উঠেছে। একজন সৈনিক নিজেকে মানুষের মর্যাদা দেবে, এতোখানি ঔদ্ধত্য মিলিটারী কর্তৃপক্ষ কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না।

কোয়ার্টার গার্ড নামক জুজুর ভয় একবার ভেঙ্গে যাওয়ার পর প্রতিবাদ করাটা একেবারেই অসম্ভব ব'লে আর মনে হয়নি। কাজেই শ্রীঘর দর্শন আমাকে কয়েকবার করতেই হয়েছে।

এই কারাদণ্ডই আমার জীবনে জাগালো নতুন এক চেতনা। আমার মিলিটারী জীবনটাকে যেন নতুন ছাঁচে ঢালাই ক'রে দিলো। এতোদিন আপিসের লোক হিসাবে সাধারণ সৈনিকদের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছিলাম।

তারা আমাকে ভালো লোক ব'লেই জানতো। তাই তারা তাদের প্রয়োজনে আসতো আমার কাছে। কাজ হাসিল হ'লে নানান ভাবে খুশী করবার চেষ্টা করতো আমাকে। কিন্তু তখনও আমাকে তাদের আপনার লোক ব'লে মনে করতো না।

এই ঘটনার পর থেকে সেই ব্যবধানের পাঁচিলটা গেল ধ্বসে। সাত দিন কয়েদ খাটার মধ্যে দিয়ে মানুষের দয়ের এক বিচিত্র রূপ দেখলাম।

কোয়ার্টার গার্ড নামক স্থানটি হ'লো কোম্পানির প্রাণকেন্দ্র। এখানে জমা থাকে একটি কোম্পানির সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলা বারুদ, আর এরই সংলগ্ন থাকে একটি কয়েদখানা। একজন গার্ড কমাণ্ডারের অধীনে কয়েকজন সেন্ট্রী এই তোপখানা এবং কয়েদখানা নিত্য পাহারা দেয়।

বিচিত্র এর পাহারাদারীর ব্যবস্থা!

যে মানুষটা আজ রাইফেলে বেয়নেট চড়িয়ে এই কোয়ার্টার গার্ডে সেন্ট্রীর কাজ করছে, সেই মানুষটাই হয়তো তার পরদিন কয়েদী হ'য়ে কয়েদখানায় আসতে পারে। আবার যে কয়েদী আজ ছাড়া পেল, সে-ই হয়তো আগামী কাল সেন্ট্রী হ'য়ে কোয়ার্টার গার্ড পাহারা দিতে আসবে!

কার ওপর কতখানি বিশ্বাস করা যায়, তা নিয়ে কর্তৃপক্ষের বিশেষ কোন মাথাব্যথা নেই।

গার্ড কমাণ্ডার একমাত্র এন্, সি, ও'দের মধ্যে থেকেই করা হয়। ওরাই চিরদিনের জন্য বিশ্বাসভাজন! ওরা যেন নাগরিক জীবনে আই,

সি, এস্ অফিসারদের মতো। ওদের গায়ের রং ছাড়া আর সব কিছুই বৃটীশত্ব প্রাপ্ত হ'য়ে গেছে। ওরা যেন আফিম খাইয়ে পোষ মানানো পাখী। খাঁচার দরজা খুলে রাখলেও উড়ে যায় না। পায়ের শিকল কেটে দিলেও ঠিকই দাঁড়ে ব'সে থাকে। আর ওদের মুখে সেই পাখী-পড়ানো বুলি।

মিলিটারী জীবনে এন্, সি, ও'দের কাছে আফিম হ'লো ওই পদমর্যাদা ? অর্থাৎ সমগোত্রিয় কিছু লোকের ওপর কর্তৃত্ব করার মোহ। ওদের ক্ষমতা যে ধার-করা ক্ষমতা, শুধুই নালিশ করার ক্ষমতা, নিজের স্বজনদের বিরুদ্ধে লাগানি-ভাঙানি করার ক্ষমতা—সেটুকু বোধশক্তিও ওই আফিমের প্রভাবে উবে যায়। মহা আনন্দে ওরা ক্ষমতা-মত্ততা নিয়ে মেতে থাকে।

কোয়ার্টার গার্ডেরও নিজস্ব কতকগুলো নিয়ম কানুন আছে। প্রথমেই ব্যক্তিগত জিনিষপত্র, পয়সাকড়ি গার্ড কামাণ্ডারের কাছে জমা ক'রে দিতে হয়। তারপর পোষাকেরও কিছু পরিবর্তন করতে হয়—যথা, শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করা, সার্ট পরা, কোম্পানির ব্যাজ ধারণ করা এবং বুটের ওপর পট্টি বা এ্যানক্লেট্ পরা নিষিদ্ধ। সর্বোপরি, কয়েদীকে ধূমপান করতে দেওয়া হয় না।

প্রাথমিক কাজগুলো সেরে গিয়ে বসলাম কয়েদখানায়। হয়তো মনটা অনুতপ্ত হ'য়ে উঠছিল। কয়েদী হওয়ার সঙ্কোচ হয়তো ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিচ্ছিল। কেমন যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ছিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন স্পেয়ার সেন্ট্রী এসে আমার দিকে একটি সিগারেট এগিয়ে ধরে। দেশলাইও ছিল তার হাতেই। বললে, আপনি খান বোসবাবু, আপনি তো আর কোন কসুর করেননি। শালারা খামোখা আপনাকে কোয়ার্টার গার্ডে দিয়েছে।

বিস্মিত হয়েছিলাম। অনেকক্ষণ সেন্ট্রীটির মুখের দিকে অপলক

দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। মনে হয়েছিল এই কোয়ার্টার গার্ড এলেকার মধ্যে এই মানুষটাও তো অন্যতম সর্বেসর্বা!

তবে কিসের প্রেরণায় সে এমন বিধিবহির্ভূত কাজ করতে সাহসী হ'য়ে ওঠে।

বললাম, গার্ড কামাণ্ডার জানতে পারলে তোমার বিপদ হবে।

স্পেয়ার সেন্ট্রী বললে, গার্ড কমাণ্ডার ক্যাম্পে গেছে। তার ওপর আমরা নজর রেখেছি। আপনি নির্ভাবনায় খান। আর যখন যা দরকার হবে, আমাকে বলবেন।

নতুন কথা শুনলাম। নতুন এক উপলব্ধি চেতনার স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়লো। ওই সেন্ট্রীর 'আমরা' অর্থে সমস্ত সেন্ট্রীরা! গার্ড কমাণ্ডার আর সেন্ট্রীরা যেন দুই শিবিরের মানুষ!

নিয়মের রাজত্বে নিয়ম ভাঙ্গাকেই নতুন নিয়ম ব'লে মেনে নিলাম। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্যায়-নিয়ম ভাঙ্গাটাই নতুন নিয়মের জন্ম দেয়। মিলিটারী নিয়ম তো মানুষের মনুষ্যত্বকে লোপ ক'রে দেওয়ার নিয়ম। আর সেই নিয়ম ভাঙ্গার মধ্যে দিয়েই তো মনুষ্যত্বকে বজায় রাখার সংগ্রাম সুরু হয়।

জীবনের পাঠশালায় নতুন পাঠ গ্রহণ করলাম।

প্রিজনার্স ফেটাগ খাটতে যাওয়ার পথে দেখেছি, ত্রিচিনপল্লীর প্রৌঢ় থাঙ্গুভেল্লু আমার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থেকে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেছে।

আমাদের সেই থাঙ্গুভেল্লু।

মনিপুর রোড স্টেশন, অর্থাৎ ডিমাপুরে আসার পর যখন কোম্পানি আপিস ঢেলে সাজানো হ'লো, তখন থাঙ্গুভেল্লুকে দেওয়া হয়েছিল হেড কোয়ার্টারস্ স্টাফের জন্য ব্যাটম্যান হিসাবে।

থাঙ্গুভেল্লুর কাজ, লঙ্গরখানা থেকে আমাদের খানা আগে থাকতে এনে তাঁবুতে রেখে দেওয়া।

এ ব্যবস্থাটা আমাদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির নিদর্শন ছিল না। এটা ছিল আমাদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য।

এই ন্যায়সঙ্গত পাওনাটুকু পেতে অনেক লড়াই আমাদের করতে হয়েছে। অবশ্য এ লড়াই কাগজে কলমে লড়াই, আইন আর নজির দেখানোর লড়াই।

মেজর বাইওয়াটার প্রথমটায় আপত্তি করেননি।

আপত্তি উঠলো প্রথমে সুবেদার সাহেবের কাছ থেকে। তার মনোভাবটা যেন স্বর্গরাজ্যে ইন্দ্রের মতো। কোথায় কে একটু প্রবল হয়েছে, অমনি ইন্দ্রের টনক নড়লো—বুঝিবা তাঁর গদি গেল!

সুতরাং তিনি কোম্পানির হিতার্থে এবং নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে মেজর বাইওয়াটারকে বোঝালেন, কোম্পানির মধ্যে আর যে সব উচ্চ-মাহিনার লোক রয়েছে, তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেবে।

সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ! মেজর বাইওয়াটার আঁৎকে উঠলেন। সেনাবাহিনীর মোরেল্ তাজা রাখবার জন্যে যেখানে সেনাবিভাগ থেকে মদ, মেয়েমানুষ পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়, সেখানে অসন্তোষের কোন কারণ সৃষ্টি করতে তিনি কিছুতেই পারেন না।

সুতরাং আমাদের আর্জি প্রথম দফায় নাকচ, হ'য়ে গেল।

কিন্তু আমরাও দমবার পাত্র নই।

মিলিটারী আইন সাগর মন্থন করতে সুরু করলাম।

ম্যানুয়াল্ অফ্ ইণ্ডিয়ান্ মিলিটারী ল, রয়্যাল আর্মি ইন্‌সট্রাক্‌সানস্ প্রভৃতি কেতাবের কমা, ফুলস্টপ্ পর্যন্ত তন্নতন্ন ক'রে খুঁজলাম। অবশেষে অমৃত উঠলো ফিল্ড্ সার্ভিস্ রেগুলেসান্ থেকে।

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ওই আইনের কেতাবে ফিল্ড সার্ভিসে থাকাকালীন অফিস স্টাফের জন্য ব্যাটম্যানের ব্যবস্থা দেওয়া আছে।

সুতরাং আমাদের জয় হ'লো। মেজর বাইওয়াটার মুচকে হাসলেন। কিন্তু সুবেদার সাহেবের মুখ চুন হ'য়ে গেল।

মেজর বাইওয়াটার লেফটেনান্ট টেরীর মতো নির্বোধ ন'ন। মিলিটারী সংস্থায় ভি, সি, ও'র তাৎপর্য তিনি সম্যকরূপেই বোঝেন।

বিদেশীর শাসন কোন দেশের মানুষই যে ভালো চোখে দেখে না, সে কথা বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ ভালোভাবেই জানে। তাই যেমন নাগরিক জীবনে তাদের প্রয়োজন আই, সি, এস্ অফিসার, স্যার, রায়বাহাদুর, রায়সাহেবদের শিখণ্ডিরূপে—অবিকল ঠিক সেই একই কারণে মিলিটারীতেও প্রয়োজন ভি, সি, ও ; এন, সি, ও জাতীয় শিখণ্ডিদের।

সুতরাং আমাদের দাবি মেনে নিয়েও মেজর বাইওয়াটার দু'কূল রক্ষার জন্যে আমাদের অধিকারে একটু চূনের ছিটে দিয়ে দিলেন। অর্থাৎ, আমরা একজন লোক পেলেও, সে পুরোপুরি আমাদের ব্যাট্-ম্যানের কাজ করবে না। কেবলমাত্র সে আমাদের খানাটা আগে থাকতে সংগ্রহ ক'রে রেখে দেবে এবং আমাদের প্লেটগুলো ধুয়ে দেবে।

থাঙ্গুভেল্লুকে দেওয়া হ'লো আমাদের ব্যাট্ম্যান হিসাবে। এটা সুবেদার সাহেবের শত্রুতা।

থাঙ্গুভেল্লু মাদ্রাজের লোক। তার মাতৃভাষা ছাড়া কোন ভাষাই সে জানে না। তাকে নিয়ে আমরা এক ঝক্মারিতেই পড়লাম।

তাঁবুতে ফিরে এক গ্লাস জল চাইলে, সে বুটজোড়া এগিয়ে দেয়! খেতে ব'সে কাঁচা লঙ্কা চাইলে সে এগিয়ে দেয় ওয়াটার বটল্টা! নুন চাইলে হয়তো কতকগুলো পেঁয়াজ এনে প্লেটের ওপর দিয়ে দেয়।

কিন্তু তার সমস্ত চোখে মুখে কী অসীম স্নেহের অভিব্যক্তি। প্রৌঢ় হয়তো মনে মনে তার নিজেরই সন্তানদের কল্পনা করতো আমাদের নিয়ে।

আমাদের মধ্যে সুলতান একটু রগচটা মানুষ। থাঙ্গুভেল্লু ওই রকম অদ্ভুত একটা কিছু ক'রে বসলে, রীতিমত ধমকধামক দেয়।

মোহিন্ত বা মজুমদার মশাই ধমক না দিলেও, প্রচণ্ড হাসতে থাকেন।

বেচারা থাঙ্গুভেল্লুর মুখখানা ভয়ে পাথর হ'য়ে যায়। ধমকের ভাষা বোঝে না। হাসির কারণও নির্ণয় করতে পারে না।

থাঙ্গুভেল্লুর দুরবস্থা আমি কিছুটা বুঝতাম। তাই কথায় না ব'লে, যতদূর সম্ভব আকারে ইঙ্গিতে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করতাম।

সহানুভূতির এইটুকু স্পর্শই থাঙ্গুভেল্লুকে আমার অত্যন্ত অনুরক্ত ক'রে ফেলে। আমার কাছেই তাই তার মনের-প্রাণের কথা উজাড় ক'রে দেয়।

সুলতানকে তার সবচেয়ে বেশী ভয়। সেইটা বুঝাবার জন্যে বলতো তার দেশজ টানে, সুলতান বাবু স্যার বহুত হট্!

ওই হট্ কথাটার তাৎপর্য বুঝবার জন্যে অনেক মাথা ঠোকাঠুকি ক'রে তবে বুঝতাম—হট্ মানে গরম, অর্থাৎ সুলতানের মেজাজটা খুব গরম।

অন্যান্য মাদ্রাজীদের কাছে জিজ্ঞেস ক'রে জেনেছিলাম, থাঙ্গুভেল্লু হট্ অর্থে গরম বলতে চায়নি। সে বোঝাতে চেয়েছে ঝাল্!

তার কথা আমি কতোটা বুঝলাম, এ নিয়ে থাঙ্গুভেল্লুর কোনই মাথাব্যথা ছিল না। আমি তাকে বকি না, বা তার কথায় বা কাজে হাসি না—এইটাই তার আমার প্রতি নিকটত্ববোধের একমাত্র কারণ।

সুতরাং তার যা বক্তব্য থাকে, তা সে অনর্গল আমার কাছে ব'লে যায়। প্রথমে সে সুরু করে হিন্দী, বাংলা আর ইংরাজী মিশিয়ে। তারপর কথার বেগ যখন বাড়তে থাকে তখন ধীরে ধীরে হিন্দী, বাংলা বা ইংরাজী ঝ'রে যেতে থাকে—তার জায়গায় স্থান নিতে থাকে বিশুদ্ধ মালয়ালাম।

তবুও আমি তার নীরব শ্রোতা। তার ধারণা, আমি তার সমস্ত কথাই বুঝতে পারছি। আর আমাকেও তারই ভাণ করতে হয়।

আমাদের সেই থাঙ্গুভেল্লু যখন দেখে, খালি মাথায়, গেঞ্জি গায়ে, কয়েদীর পোষাকে বেল্‌চা আর গাঁইতি কাঁধে মাটি কাটতে চলেছি—তখন তার মনের মধ্যে কোন আবেগ বলবতী হ'য়ে ওঠে, তার বিন্দুবিসর্গও আমি বুঝতে পারি না। কেবল দেখি মুক্তার বিন্দুর মতো ফোঁটার পর ফোঁটা তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

থাঙ্গুভেল্লুকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাই জঙ্গলের দিকে। সেখানে আমাকে মাটি কাটতে হবে দৈনিক আট ঘন্টা হিসাবে।

ক্যাম্পের প্রান্তে অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় রফিক আমারই জন্যে অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তার উত্তেজিত মুখচোখ দেখে কেমন যেন ভয় ভয় করে।

সহজ সরল ভাষায় সোজাসুজি রফিক আমার অনুমতি চায় লেফটেনাট লীচ্‌কে ঘা-কতক লাগাবার।

রফিককে আমি ভালোভাবেই চিনি। মুখে সে যা বলে, কাজে তা সে অনায়াসেই করতে পারে।

তার দুটি হাত ধ'রে মাথার দিব্যি দিয়ে কথা আদায় করেছি, এমন কাজ সে করবে না।

জঙ্গলের মধ্যে মাটি খোঁড়ার সময়ে লঙ্গরখানার বাচ্চা লাঙ্গরি আবদুল লুকিয়ে লুকিয়ে চা এনেছে।

আরও কত রকমের স্বীকৃতি পেয়েছি ওই সাতটা দিন। দিনের প্রতি মুহূর্তটাই যেন আমার কাছে অমূল্য হ'য়ে উঠেছে।

এসেছে সস্নেহ উপহার নানান জনের কাছ থেকে নানান ভাবে। কোন দিন এসেছে বাজার থেকে কিনে আনা খাবার দুর্ভেদ্য কোয়ার্টার গার্ডের রন্ধ্রপথে। কখনও ইয়ার্ডে রান্না-করা মুরগির মাংস। সেন্ট্রীদের কাছে আমার জন্যে সিগারেট-দেশলাই কে বা কারা সব সময়েই মজুদ রেখেছে। সেন্ট্রীরাও

ডিউটি বদলের সময়ে সেই সিগারেট-দেশলাইয়ের ষ্টক্ নতুন সেণ্ট্রীদের কাছে হ্যাণ্ড-ওভার্ ক'রে দিয়ে যায়।

এতো উপহার এনেছে কারা ?

ক্যাম্পের লোক ?

আমি তো জানতাম না কোম্পানির মধ্যে কোন গোপন সংগঠন আছে !

সত্যিই ছিল না।

তবুও এই সমস্ত বেআইনী কাজ নিপুণ গোপনতায় সমাধা হয়েছে ! যারা কর্তৃপক্ষের পাহারাদার, সেই সান্ত্রীদের মাধ্যমেই নিয়ম ভাঙার মহড়া চলেছে দিনে রাতে। ধীরে ধীরে ক্যাম্প আর কোয়ার্টার গার্ডের মধ্যেকার বেড়া সৈনিকদের পায়ের চাপে চাপে মাটিতে মিশিয়ে গেছে।

সমস্ত কোম্পানিটা যেন এক এবং অবিভাজ্য হ'য়ে উঠেছে।

উনিশশো চুয়াল্লিশের সূত্রপাতেই ভারতের পূর্ব সীমান্ত অশান্ত হ'য়ে উঠলো।

আমরা ভাবলাম, বুঝিবা কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হ'লো।

উনিশশো বিয়াল্লিশের মাঝামাঝি থেকে উনিশশো তেতাল্লিশের শেষ—সুদীর্ঘ দেড় বছরের সুষুপ্তি। তাই বুঝিবা সে নিদ্রাভঙ্গও দীর্ঘসূত্রতায় মন্থর।

যে জাপান এতোদিন অপেক্ষা করছিল ইউরোপের যুদ্ধের ফলাফলের ওপর—সেই জাপান এতোদিনে ধৈর্য ফেললো হারিয়ে।

দোসর জার্মানি তখন রাশিয়ার মাটিতে ধরাশায়ী। রাশিয়ার লাল ফৌজ তখন পশ্চিমাভিমুখী। দিনে দিনে বার্লিন নিকটতর হ'য়ে আসছে।

জাপান হয়তো ভেবেছিল, জার্মানি যখন ঘায়েল, তখন বুঝিবা সাঙাতকে ভারতের ভাগ আর দিতে হবে না। ভারত সমেত সমস্ত পূর্ব-এশিয়া হবে তারই কুক্ষিগত।

দুই যুদ্ধ—উনিশশো চৌদ্দ আর উনিশশো উনচল্লিশ—মাঝখানে কেটে গেছে পঁচিশটা বছর। এই পঁচিশ বছরে যে পৃথিবীর বুকে আমূল পরিবর্তন ঘ'টে গেছে, সে কথাটা সাম্রাজ্যবাদীরা তখনও সম্যক উপলব্ধি করতে পারেনি। তাই তারা পৃথিবীর মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের মনের মতো ক'রে লাল পেন্সিলের দাগ টেনে ভেবেছিল, পৃথিবীটা বুঝিবা সত্যিই কমলালেবুর মতো। তার কোয়াগুলো ভাগাভাগি ক'রে নিলেই ভাগ-বাঁটোয়ারা চূড়ান্ত হ'য়ে গেল।

কিন্তু ওদের এমন সাধে বাদ সাধলো ঈশ্বরবর্জিত রাশিয়ার অসুরেরা। উভয় পক্ষেরই সমস্ত জল্পনা-কল্পনা বুঝিবা বানচাল হওয়ার উপক্রম! গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী আর ফ্যাসিস্ট বর্বর—দু'দলেরই হিসাবে ভুল হ'য়ে গেল।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি জাপান টিডিম দখল করলো।

ভগবান তথাগতের আশীর্বাদ যেচে নিয়ে বুদ্ধভূমি ভারতবর্ষের দিকে পা বাড়ালো জাপান। পা বাড়িয়েছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুর মতোই নিঃসম্বল হ'য়ে, ছোট ছোট দলে, পথে বিপথে, শহর নগর এড়িয়ে গ্রাম জঙ্গলের পথ ধ'রে।

ভারতের মতো বিরাট ভূখণ্ড অধিকার করতে হ'লে যে শক্তি আর প্রস্তুতির আবশ্যিক প্রয়োজন, সে সামর্থ্য তখন জাপানের ছিল না। রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিই ছিল তাদের একমাত্র সম্বল।

তাই ঔপনিবেশিক দেশে দেশে জাপানী ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের মিতালী সহজতর হ'য়ে যায়। পরাধীনতার হাত-বদলকেই তো তারা জাতীয় স্বাধীনতা মনে করে।

জাপানের একমাত্র ভরসাস্থল, ঔপনিবেশিক দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদীরা।

'টিড্ডিম'এর পর প্যালেল্'এরও পতন ঘটলো!

আমাদের জীবনে নেমে এলো এক অভিনব যুগ। দেখলাম, মিলিটারী কর্তারা রাতারাতি গণতন্ত্রী হ'য়ে উঠেছেন। ক্যাম্পশুদ্ধ লোক জড়ো ক'রে মেজর উইল্‌সন্ জানালেন, আমরা আক্রান্ত!

সব ক'জন অফিসারই উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মুখের ছবিগুলো যেন আজও চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই। সে কি মুখ! কী করুণ! কী অসহায়! কথা বলতে গেলে গলা কাঁপছে! চোখে জল ছল্‌ছল্ করছে! দু'কথা বলতেই গলা বুজে আসছে।

অবাক হ'য়ে আমরা অনেকক্ষণ ওই মুখগুলোর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, যাত্রাদলের রাজার সাজপোষাক বুঝিবা খ'সে পড়েছে! অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকার দরুণ মেজর সাহেবের ভাষণের বিশেষ কিছুই কানে যায়নি। পরে শুনেছিলাম, মেজর সাহেব নাকি খুব ভালো ভালো কথা বলেছেন।

আমাদের মহান দায়িত্বের কথা! অকুণ্ঠ সহযোগীতার কথা! ভারতভূমির আসন্ন বিপদের কথা! আরো কতো কী!

যেন ভারতবর্ষ শুধুই আমাদের মাতৃভূমি—ওঁদের সাম্রাজ্যের প্রাণ-কেন্দ্র নয়!

অবশেষে সোজা কথা সহজভাবেই বুঝেছিলাম, 'সিংহের গলায় হাড় ফুটিয়াছে।'

খুব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি আমাদের এই স্বর্ণ যুগ। মাত্র কয়েকটা মাস। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ওই দিনগুলো মিলিটারী জীবনে দিয়ে গেল এক নতুন আস্বাদ, আর রেখে গেল স্থায়ী মোহমুক্তি।

ক্যাম্প জীবন ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল। কোথায় গেল সেই রুটীন বাঁধা জীবন। সকালের পি, টি থেকে রাতের লাইট্-আউট্।

কোথায় গেল সেই তেত্রিশ কোটি দেবতার মতো স্তরে স্তরে ওই শালগ্রাম শিলার দল। বৃটীশ অফিসার থেকে নন্ কমিসন্ড্ অফিসার—কোম্পানির কমাণ্ডিং অফিসার মেজর উইল্‌সন্ থেকে লঙ্গর কমাণ্ডার ল্যান্স-নায়েক তাওজী পর্যন্ত। ওরা নিজেরা কোনদিনই কোনও কাজ করে না। অথচ বিভাগে বিভাগে ওরাই সর্বময় কর্তা। ওরা ছড়ি ঘুরিয়ে আমাদের কাজ তদারক করে, খুঁত ধরে, চার্জ সীট দেয়, কয়েদীকে ফেটীগ খাটায়।

কিন্তু এমন সময়ে ওদের কিছুই করবার নেই।

পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধ ধীরে ধীরে জ'মে ওঠে। ইম্‌ফলকে পাশ কাটিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে জাপানীরা কোহিমার আশেপাশে জমায়েৎ হ'তে থাকে।

কোহিমা যায় যায়! শোনা গেল, নাগা পাহাড়ের ইংরেজ ডিভিসন্যাল কমিশনার উধাও। এক এক সময় এমন ধারণাও হয়েছে, কোহিমা বুঝিবা সত্যি সত্যিই ফল্ করেছে।

অপূর্ব এই দিনগুলি। আমরাই যেন সর্বেসর্বা। আমরাই কাজ করি। আমরাই নিত্য নতুন কাজের নিয়ম তৈরী করি। অফিসারদের দেখাই পাওয়া যায় না স্টেশনে বা ইয়ার্ডে।

জাপান যতোই এগিয়ে আসছে, বৃটীশ অফিসাররা ততোই পলায়ন তৎপর হ'য়ে উঠছে।

মহাবীর নেল্‌সনের দেশের লোক ট্রাফালগার স্কোয়ারে আজও প্রতিদিন নেলসনের মূর্তির পাদপীঠে ফুলের গুচ্ছ রেখে নতি জানায় বীরের আত্মত্যাগের প্রতি।

আর আসাম-বর্মা সীমান্তের এরিয়া হেড্ কোয়ার্টারসের কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার থেকে আমাদের মতো ক্ষুদে নগণ্য কোম্পানির অফিসাররাও প্রহর গোনে পলায়নের সেই পরম মুহূর্তটির অপেক্ষায়।

আমাদের মতো ভারতীয় সৈন্যরাই তখন নাগা পাহাড়ের ঝোপে

ঝাড়ে কয়েক রাউণ্ড গুলি আর একটা রাইফেল নিয়ে প্রহরারত।

কিসের পাহারায়?

আমাদের জননী মাতৃভূমির পাহারায় নয়! পাহারা দিচ্ছে মহামহিম ভারতেশ্বরের বীর সেনানায়কদের পলায়ন পথ!

তাই আমরাই, অর্থাৎ ভারতীয় সৈনিকরাই দায়িত্ববোধ করেছিলাম, ভারতভূমিকে যুদ্ধভূমিতে পরিণত হওয়ার পথ রোধ করতে। অতি সাধারণ বুদ্ধি আর তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলাম, ভারতের মানুষের ওপর দরদ কারও নেই—না বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের, না আমাদের দেশের নেতাদের। তাদের দেশ, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র—সবই লাভ আর লোভের মধ্যে সীমাবদ্ধ—নিছক স্বার্থকেন্দ্রিক!

দেশদ্রোহিতার অভিযোগ কবুল ক'রেও সেই দিনগুলোতে জান্-প্রাণ দিয়ে খেটেছিলাম জাপানকে রুখবার জন্যে। স্যাবোতাজ্ করার কথা মাথায় আসেনি, রেলের লাইন উপড়ে ফেলার কথা চিন্তাও করিনি। দৃঢ় বিশ্বাস জেগে উঠেছিল, জাপানকে রুখতে পারলে, এই ভীরু কাপুরুষ বৃটিশ নবাবদের মেয়াদ আর কতদিন!

যে জাপান কোহিমা পর্যন্ত এসে পড়েছে, যে জাপান সেকেণ্ড বৃটিশ ডিভিসনকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে, যে জাপানী সৈন্য ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে পড়তে বোকাজানে, ধানসিরিতে, গোলাঘাটে—সেই অপরাজেয় জাপানী সৈন্যদের ভারতের মাটি-ছাড়া করলো ভারতীয় সৈনিকরাই। তারা দেখিয়ে দিল, বৃটিশ সৈন্যের চেয়ে তারা অনেক বেশী মজবুত, অনেক ভালো যোদ্ধা।

যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল।

আর তারই সাথে সাথে মনের মোড়ও ঘুরলো সেই সব বৃটীশ অফিসারদের, যারা এতোদিন দাড়ি কামাতে, বুট পালিশ করতে ভুলে গিয়েছিল।

যারা পথকুক্কুরের মতো [illegible] সন্ত্রাসে পেছন পানে তাকিয়েছে

আর সামনে পালাবার পথ খুঁজেছে—তারাই আবার সিংহশাবক হ'য়ে উঠলো। ফিট্‌ফাট পোষাকে সুসজ্জিত হ'য়ে তারাই আবার মহাবীর নেলসনের বংশধর হ'য়ে উঠলো। তাদের যে কাপুরুষতা আর অপদার্থতা আমাদের চোখে নগ্নরূপে ধরা প'ড়ে গেছে, সেই কাপুরুষতাকে তারা ঢাকা দিতে চাইলে আমাদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ থেকে দশগুণ বাড়িয়ে।

কিন্তু 'রাজার মাথায় গাধার কান' আমরা দেখে ফেলেছি!

সে মাথায় যতো বড় তাজই চাপানো হোক না কেন, আমাদের চোখের ওপর সেই 'গাধার কান'ই জাজ্বল্যমান।

ফিফ্‌থ ইণ্ডিয়ান ডিভিসন এগিয়ে চলেছে দুর্মদ পদক্ষেপে।

ভারতভূমি নিষ্কলুষ ক'রে বর্মাকে মুক্ত করতে চলেছে। দিনে দিনে সে গতি দুর্বার হ'য়ে উঠছে।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সাল পড়তে-না-পড়তে আসামের চেহারা গেল বদলে।

এ পরিবর্তন ভৌগলিক বা প্রাকৃতিক নয়।

আসাম তখন ভারতের শুধুই একটি প্রদেশ নয়—বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র। বৃটীশ ভারতীয় বাহিনীর তিন-চতুর্থাংশের সেনা-ছাউনি।

সেই আসামে অবস্থিত বৃটীশ ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে দেখা দিলো এক নতুন রূপ।

ভারতীয় সৈন্যরা, যারা একদা বৃটীশ ভারতের নিরিহ প্রজার মনোভাব নিয়ে সেনা বাহিনীতে সামিল হয়েছিল, তারা যেন কখন শুধুই ভারতীয় হ'য়ে উঠেছে। অসহিষ্ণুতা যেন দিনে দিনে আনুগত্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীরকে উল্লঙ্ঘন করবার প্রয়াস পাচ্ছে। কোথা থেকে,

কোন অতল থেকে জেগে উঠছে দুরন্ত আক্রোশ। আর সেই আক্রোশ যেন ফেটে পড়তে চাইছে শতখান্ হ'য়ে। অবুঝ বুঝিবা এই আত্মঘাতী আক্রোশ।

বহু কথা বাতাসে ভেসে আসে। সাকভারাটের ধূম্রজাল যেন অপসারিত হ'য়ে যায়! এ কোম্পানির সেপাই ও কোম্পানির সেপাইয়ের কাছে মনের কথা আর প্রাণের ব্যথা উজাড় ক'রে দিতে চায়। ন'নান খবর ফিস্‌ফিসিয়ে বেড়ায় ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে, ব্যারাক থেকে ব্যারাকে। কোম্পানিতে কোম্পানিতে নানান ঘটনার অবতারণা।

এমন সময়ে একদিন গিয়েছিলাম কোম্পানির রেশন্ আনতে। কোম্পানির ট্রাকে চ'ড়ে গেছি ফেটীগ খাটতে, অর্থাৎ মোট বইতে।

আর্, আই, এ, এস্, সি'র ডিপোয় ঢুকে বিচিত্র এক দৃশ্য দেখলাম।

এক কয়েদী কি ভাবে যেন একটা রাইফেল্ আর কয়েকটা রাউণ্ড জোগাড় ক'রে কোয়ার্টার গার্ড থেকে পালিয়েছে। সকাল থেকে খোঁজাখুঁজি ক'রে তাকে পাওয়া গেছে ওই ডিপোর অন্তর্গত এক ঝোপের মধ্যে।

কিন্তু তার কাছে কেউ যেতে পারছে না। সে নাকি রাইফেল লোড্ ক'রে লাইং-পজিশনে এইম্ নিয়ে তৈরী হ'য়ে আছে। ঘোষণা ক'রে দিয়েছে, কোম্পানির ও, সি'কে মেরে সে নিজে আত্মহত্যা করবে।

কোন মানুষকে দেখতে পেলেই চিৎকার ক'রে বলছে, ভেজো উয়ো শালা কুত্তাকো!

গেট পার হ'য়ে কয়েক গজ যাওয়ার পরই আমাদের ট্রাক আটকানো হ'লো। রাস্তার ওইখানটা থেকে একটা ঢল্ নেমে গেছে। সেই খাদের মধ্যে আগাছার জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যেই নাকি সেই পলাতক কয়েদীটি বিরাজ করছে।

রাস্তার পারে দাঁড়িয়ে কয়েকজন সৈনিক, তার মধ্যে এক বৃদ্ধ সুবেদার। সৈনিকগুলি নাকি ওই পলাতক কয়েদীর ভাই-বেরাদার, আর সুবেদার সাহেব তার গ্রামের লোক। ওরা সকাল থেকে বহুবার তাকে সাধ্যসাধনা করেছে, রাইফেলটা ফেলে রেখে উঠে আসতে। সুবেদার সাহেব কোম্পানি কমাণ্ডারের তরফ থেকে আশ্বাস দিয়েছেন, তাকে কয়েদ থেকে খালাস ক'রে দেওয়া হবে, বাড়ীতে যাওয়ার জন্যে তাকে ছুটি দেওয়া হবে। ও, সি, সাহেব তার কসুর মাফ করেছেন।

কোন ফল হয়নি এ সাধ্যসাধনায়। রাস্তা থেকে খাদে নামতে তারা সাহস পায়নি। তারা জানে লী এনফিল্ড রাইফেলের রেঞ্জ কতদূর! আরও জানে পয়েন্ট থ্রি-ও-থ্রি বুলেটের মাহাত্ম্য!

সেদিন আমাদের রেশন নেওয়া হয়নি। আমরা ফিরে এলাম।

ফেটীগের বোঝা বইতে হ'লো না বটে, কিন্তু বিরাট এক বোঝা মনের ওপর চাপিয়ে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরলাম।

আধ ঘণ্টার মধ্যে এ খবর ক্যাম্পময় রাষ্ট্র হ'য়ে গেছে। এমন বোধহয় একজনও নেই, যে খবরটা আরও পুষ্পিত, পল্লবিত আকারে না শুনেছে!

আমার মন কিন্তু প'ড়ে ছিল নাম-না-জানা, চোখে-না-দেখা সেই পলাতক কয়েদী সিপাইটির ওপর। কেন যেন মনে হয়েছিল, এক শতাব্দী শেষ হ'তে না হ'তে আবার বুঝি মঙ্গল পাণ্ডে ফিরে এসেছে।

কিন্তু স্থির বুঝেছিলাম, ওই সিপাইটি তার কোম্পানির কমাণ্ডিং অফিসারকে কখনই মারতে পারবে না। মরতে হবে ওকেই—সে যে ভাবেই হোক। আত্মহত্যা করেই হোক বা ফাঁসিতে লটকেই হোক্।

এই ঘটনাটির মধ্যে বৃহত্তের কোন বীজ তো নেই। নিছক খানিকটা আক্রোশ। ওই বিক্ষুব্ধ সিপাইটি শুধুই তার ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করতে চায়।

কিন্তু এইটাই তো অতি-নতুন ব্যাপার !

একজন ভারতীয় সিপাই তার কোম্পানির সর্বেসর্বা কমাণ্ডিং অফিসারের কোন কাজকে এতোখানি অসহনীয় মনে করেছে যে, নিজের জীবনের বিনিময়ে সেই অফিসারকে সে চরম শিক্ষা দেওয়ায় সঙ্কল্প নিয়েছে। সে আশা করেছে, তা হ'লেই আর ওই জাতীয় অসহনীয় অন্যায় ঘটবে না।

অশিক্ষিত ওই সিপাইটি তো জানেনা যে, ওই অফিসারটি নিশ্চিহ্ন হ'লেই তার প্রতি যে অবিচার হয়েছে, তা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাচ্ছে না। ওই অবিচারের শিকড় কত গভীর, তা কেমন ক'রে জানবে লাঙল ছেড়ে রাইফেল ধরা এক কৃষক !

এতো তত্ত্ব, এতো তাৎপর্য সে না বুঝুক, তার মধ্যে এক ব্যক্তি জেগে উঠেছে। সে ব্যক্তি তার সরল মনের ধ্যান-ধারণা দিয়ে বুঝেছে, তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। এই উপলব্ধি থেকে সেই ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হয়েছে, তার পর সে খুঁজেছে প্রতিকারের পথ ! যে রাস্তা সে বেছে নিয়েছে, সে রাস্তায় যে প্রতিকার হ'তে পারে না—এ কথা তাকে বুঝাবে কে ?

তবুও ঘটনাটির নতুনত্ব এইখানে যে, যে মানুষ আর কিছুদিন আগেও ছিল যন্ত্রের সামিল, সে আজ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হ'য়ে উঠেছে। তা' না হ'লে কবে কোন্ সৈনিক তার ঊর্ধ্বতন অফিসারের ব্যবহারের বিচার করেছে !

অফিসার, তার ওপর যদি হয় রাজার জাত—সে তো ঈশ্বরেরই অংশ !

অস্থির আর উদ্দাম দিনগুলি

ক্যাম্পে ক্যাম্পে, ব্যারাকে ব্যারাকে মানুষগুলো যেন মরীয়া হ'য়ে

উঠছে। যে মৃত্যুকে তারা অবধারিত জেনে মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছিল, সেই মৃত্যু যেন ধীরে ধীরে দূর দূরান্তরে স'রে যাচ্ছে।

জাপান তখন বর্মার শেষ সীমান্তে পৌঁচেছে। আর রাশিয়ার লাল ফৌজ বার্লিনের দুয়ারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

এই রকম একটা সময়ে আমাদেরই প্রতিবেশী কোম্পানি পাঁচ নম্বর সি এ্যাণ্ড এম্ গ্রুপে ঘ'টে গেল আরও বিচিত্রতর এক কাণ্ড।

ওই ইউনিটের হাবিলদার মেজর খুবই জনপ্রিয়। সুবেদার এবং জমাদার সাহেব এই ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখতেন না। এই নিয়ে ছিল তাঁদের রেষারেষি, মন-কষাকষি। শেষ পর্যন্ত এই বিরোধের কথা অফিসারের কানে উঠলো।

বৃটিশ অফিসাররা নিশ্চয়ই অশিক্ষিত এই সুবেদার আর জমাদারের চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধি ধরেন। আসল কথাটাই তাঁরা পরিষ্কারভাবে বুঝলেন। চিন্তিত হ'য়ে উঠলেন এই ভেবে যে, একজন হাবিলদার মেজরের জনপ্রিয় হওয়াটা একটা মিলিটারী ইউনিটের পক্ষে মোটেই ভালো কথা নয়। হাবিলদার মেজরের জনপ্রিয় হওয়ার অর্থ, সমস্ত ইউনিটটাই তার করতলগত। তার মানে, এই ইউনিটে সে যে কোনদিন যা খুশী তাই করতে পারে।

সুতরাং হাবিলদার মেজরকে কোম্পানি অর্ডার মারফত সাধারণ হাবিলদারের র‍্যাঙ্কে নামিয়ে দেওয়া হ'লো। আর এই ঘটনাকে বিশেষভাবে স্মরণীয় ক'রে রাখার জন্যে রোল-কলেই তার কব্জি থেকে ক্রাউনটা খুলে নিলেন জমাদার সাহেব। ইউনিটের লোকেরা আরও অবাক হ'য়ে দেখলে, সব কয়টি অফিসারই সেদিনকার রোল-কলে উপস্থিত।

এমন ক্ষেত্রে যেমন আচরণ করা উচিত, হাবিলদার মেজর তার কোন ব্যতিক্রম করেননি। খাড়া এ্যাটেন্‌স্‌ন্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কেবল বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন জমাদার সাহেবের দিকে।

· ইউনিটের সাধারণ লোকেরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল এ ব্যাপারে। তারাও ভাবছিল, প্রতিরোধকল্পে কিছু করা যায় কিনা। প্রাক্তন হাবিলদার মেজর আদর্শ সৈনিকের মতোই তাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন, ফৌজমে পহেলি কাম্ হ্যায় হুকুম্ মান্না।

হুকুম হাবিলদার মেজর সাহেব মেনেছিলেন নিখুঁত ভাবে। তিনি যে একদা ইউনিটের হাবিলদার মেজর ছিলেন, সেই কথাটা ব্যারেকের তরেও কারও মনে পড়তে দেননি।

সাতদিন বাদে তিনি ছুটির আর্জি পেশ করলেন জমাদার সাহেবের কাছে।

জমাদার এবং সুবেদার সাহেব দু'জনেই খুশী। হাবিলদার মেজরের পদাবনতির ব্যাপারটা নিয়ে ইউনিটের মধ্যে গুঞ্জন তখনও থেমে যায়নি।

প্রাক্তন হাবিলদার মেজরের ছুটি মঞ্জুর হ'য়ে গেল। তিনি যাবেন থ্রি-থার্টি ডাউনে সন্ধ্যা নাগাদ মোট-ঘাট বেঁধে যথাসময়ে ক্যাম্প থেকে রওনা হ'য়ে গেলেন। ইউনিটের লোকেরা ঘিরে ধরলো তাঁকে। সঙ্গে যেতে চাইলো স্টেশন পর্যন্ত!

তাদের নিরস্ত ক'রে হাবিলদার মেজর স্টেশনে পৌঁছলেন। ট্রেণ এলো—আবার চ'লেও গেল। ওই ট্রেণে ওঠবার কোন চেষ্টাই করলেন না তিনি।

সন্ধ্যা উতরে গেল। ডিমাপুর বেস'এ অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি বেরিয়ে পড়লো, কালো বোরখার ওপর রূপালী বুটি বুনে।

হাবিলদার মেজর সাহেব তাঁর মোটঘাট ওয়েটিং রুমে রেখে ইউনিটে ফিরে গেলেন। যেন তিনি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কি একটা জিনিস ফেলে এসেছেন।

প্রবেশ পথে সেন্ট্রী জিজ্ঞেস করলে, আপ্ নহি গয়া হাবিলদার মেজর সাব্?

ইউনিটের লোকেরা এখনও তাঁকে হাবিলদার মেজরই বলে।

সংক্ষেপে তিনি উত্তর দিলেন, আজ তাঁর যাওয়া হ'লো না! কাল তিনি যাবেন তাঁর এক দেশোয়ালীর সঙ্গে।

গেট্ পার হ'য়ে প্রাক্তন হাবিলদার মেজর গিয়ে উঠলেন কোয়ার্টার গার্ডে।

তাঁর ছুটিতে যাওয়ার প্রসঙ্গ স্বভাবতই উঠলো। তাই থেকে নানান কথা! কথায় কথায় কখন যেন তিনি গার্ড কমাণ্ডারের লোড-করা ষ্টেন গানটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকেন।

সকলেই অন্যমনস্ক। হাবিলদার মেজরের প্রতি কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারে সকলেই ব্যথিত।

ক্যাম্প তখন নিশুতি। ইউনিটের খানা শেষ হ'য়ে গেছে। যে যার ব্যারাকে অলস সময় যাপন করছে। রোল্‌কল তখনও বাকী।

অফিসার্স মেস'এ ব'সে আছেন অফিসাররা পানপাত্র হাতে। ডিনারের লগ্ন তখনও আসেনি।

সুবেদার ও জমাদার সাহেব তখন খানা খাচ্ছেন তাঁদের কোয়ার্টারে।

এক সময়ে প্রাক্তন হাবিলদার মেজর ষ্টেন গানটি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কারও মনে কোন প্রশ্ন জাগেনি হাবিলদার মেজর সাহেবের ব্যবহার সম্পর্কে। আর কয়েকদিন আগে ওই মানুষটাই তো তাদের রাইফেল ধরতে শিখিয়েছে, ষ্টেনগান লোড করার তালিম দিয়েছে!

কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে হাবিলদার মেজর গভীর দৃষ্টিতে গার্ড কমাণ্ডারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সে দৃষ্টির মধ্যে কি-যেন ছিল, যার ফলে গার্ড কমাণ্ডার বিহ্বল হ'য়ে পড়ে। ওই মানুষটার অপমানের বেদনায় তারও বুক কানায় কানায় ভরা।

হঠাৎ হাবিলদার মেজর কোয়ার্টার গার্ডের স্তিমিত আলোর মধ্যে থেকে অন্ধকারের মধ্যে ছুটে গেলেন।

সামনে চতুষ্কোণ একটা ছোট মাঠ। ওইখানেই ইউনিটের প্যারেড হয়। মাঠের প্রান্তে অফিসার্স মেস্। তার ছেঁচা বেড়ার দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে হ্যাজাকের আলোর কয়েকটা রশ্মি ঠিকরে আসছে।

গার্ড কমাণ্ডার বুঝতেই পারেনি, হাবিলদার মেজর দৌড়লেন কোনদিকে। বিহ্বল মনে, অন্ধ-দৃষ্টিতে সে মাঠের পানে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর নেমে পড়ে মাঠের ওপর।

মাঠের মাঝামাঝি পৌঁছবার আগেই অফিসার্স মেস্ থেকে আওয়াজ আসে, ডা—ডা—ডা—ডা।

গার্ড কমাণ্ডার ছুটে আসে গার্ডরুমে। নিয়মমাফিক বাজিয়ে দেয় পাগলা ঘন্টি।

ক্যাম্পের সমস্ত লোক, যে যেভাবে ছিল, সেই ভাবেই এসে মাঠের মাঝখানে ফল্ ইন্ করে। কোয়ার্টার গার্ডের সেণ্ট্রীরা গার্ডরুমের বাইরে কোণে কোণে গার্ড স্ট্যাণ্ড-টু পজিসনে দাঁড়িয়ে যায়।

বিস্মিত বিহ্বল লোকগুলোর চোখের ওপর দিয়ে প্রাক্তন হাবিলদার মেজর প্যারেড-গ্রাউণ্ডের মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালেন। স্টেন্-গান্'এর নজ্‌ল্ দিয়ে তখনও ক্ষীণ ধোঁয়া বার হচ্ছে।

অভ্যাসবশে হাবিলদার মেজর হুকুম দিলেন, কো-ম্পা-নি এ্যাটেন্—সান্।

সমস্ত লোক এ্যাটেনসান্ হ'য়ে দাঁড়ালো।

হাবিলদার মেজর বোল্-কলে লেক্‌চার দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, শুনো জোয়ান, ম্যায় বদলা লেনে মাঙ্গাথা। আভি সমঝতা হ্যায় কি দো-চারসে কাম্ পূরা নহি হো সক্‌তা।

স্তব্ধ, নির্বাক মানুষগুলোর চোখের সামনে স্টেন্-গানের মাজ্‌ল্‌টা

কণ্ঠনালিতে স্থাপন করলেন লাঞ্ছিত, পদাবনত, প্রাক্তন হাবিলদার মেজর। আকাশের দিকে মুখ তুলে বললেন, হুঁয়া যাকে ম্যায় পূরা বদ্‌লা লিউঙ্গা।

তারপর স্টেন্ মেসিন্ কার্বাইন্ রিকয়েল্‌ড্ স্প্রিং অপারেটেড্ অটোম্যাটিক ওয়েপনের একটি বিশ্বস্ত গুলি ছুটে গেল লক্ষ্য ভেদ ক'রে। সিঙ্গার সুইং মেসিন কোম্পানির এই অপূর্ব আবিষ্কারটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এক অভিনব অবদান।

তার পরের ঘটনা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার এক অপূর্ব নমুনা। তিনটি বৃটাশ অফিসারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথারীতি সাড়ম্বরেই সমাধা হ'লো।

নতুন অফিসাররা এসে কোম্পানির ভার নিলেন।

ডারহাম্‌স্ কিংবা ডি, সি, এল্, আই জাতীয় ইন্‌ফ্যান্ট্রি থেকে একটা স্কোয়াড্ এসে কোয়ার্টার গার্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করলে।

ইউনিট তার ছকে-বাঁধা নিয়মেই চলতে থাকে। কেবল সেদিনকার গার্ড ডিউটিরত মানুষগুলোকে কোথায় যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়!

আর প'ড়ে থাকে হাবিলদার মেজরের লাশটা মাঠের মাঝখানে মুখ থুবড়ে। দিনের রোদ আর রাতের শিশিরে সেই লাশ প'চে গ'লে যেতে থাকে। ইউনিটের লোকেরা থেকে থেকে চোখের কোণে সেদিকে তাকায়।

তাদের মনে তখন কী কথা জেগে ওঠে, সে খবর কেই বা নেয়!

সংক্রামক ব্যাধির মতোই এই অসন্তোষ যেন ছড়িয়ে পড়ছে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর অঙ্গে অঙ্গে।

আমরাও বাদ গেলাম না। আমাদের কোম্পানিতেও ঘ'টে গেল ক্ষুদ্রতর একটা ঘটনা।

সেদিন ছিল রুট্ মার্চ।

যথা সময়ে আমরা জন পঞ্চাশ রওনা হ'লাম। অনেক পথ ঘুরে প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে একটা টিলার মাথায় উঠে হল্ট এবং ব্রেক্ অফ্ফ করলাম।

শুনলাম, ফিল্ড ক্রাফ্টের কিছু মহড়া দেওয়া হবে ওই টিলার মাথায়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর হুকুম হ'লো ওই টিলার ঢালু বেয়ে ক্রল্ করবার।

হুকুম আমরা অমান্য করিনি। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের সায়েস্তা করা হচ্ছে।

এই ধরণের শাসানী ওই সময়টাতে আমাদের অহরহ শুনতে হ'তো। কোম্পানিতে নাকি হুকুম-না-মানার প্রবণতাটা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কোয়ার্টার গার্ড তখন কয়েদীতে ঠাসাঠাসি।

যুদ্ধের শেষ তখন দৃষ্টির নাগালের মধ্যে এসে গেছে। তবু, তখনও ফিল্ড ক্রাফ্টের নতুন ক'রে মহড়া দেওয়ার তাৎপর্য বুঝতে আমাদের একটুও অসুবিধে হয়নি। কর্তৃপক্ষের মনোভাবটা যেন স্বচ্ছ হ'য়ে উঠেছিল আমাদের চোখের ওপর।

তৎসত্ত্বেও ক্রল্ আমরা নিয়ম মাফিকই করেছিলাম। অত্যন্ত সাবধান হ'য়েই করেছিলাম। জীবনের ওপর তখন মায়া জন্মেছে। বাড়ী-ফেরার দিনের কথা তখন আমরা ভাবতে পারি।

ধীরে ধীরে বুকে হেঁটে ঢালু বেয়ে নামছি। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ আছে, একটু অন্যমনস্ক হ'লেই ঢালুর গা বেয়ে গড়িয়ে পড়তে হবে অন্তত বিশ-পঁচিশ হাত নিচে।

হাত, পা, বুক ছ'ড়ে যাচ্ছে। ধুলো বালি লেগে ক্ষতস্থানগুলো জ্বালা করছে। বেপরোয়া হ'য়ে ওঠার জন্যে মনের ভারসাম্য বারম্বার শিথিল হ'য়ে যাচ্ছে।

এমন সময়ে স্যাপার এন্, সি, পাল কি ভাবে যেন বেসামাল হ'য়ে

গড়িয়ে পড়লো। একবার গড়াতে সুরু ক'রে আর সে নিজেকে সামলাতে পারলো না। তলা পর্যন্ত গিয়ে একটা পাথরে আটকে গেল।

স্যাপার পালকে যখন আমরা তুলে আনলাম তখন সে প্রায় অজ্ঞান হ'য়ে গেছে।

আমরা সকলেই গুম্ মেরে গেছি। কথা কইলেই বুঝিবা ফেটে পড়বো। হয়তো হুকুমের মালিক ওই হাবিলদার মেজরের টুঁটি টিপে ধরবো! হিংস্র পশুর মতো তাকে নখে দাঁতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবো! নিজেদের ভয়ে নিজেরাই এমন সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছি যে, হাবিলদার মেজরের মুখের দিকে তাকাতে পারছি না।

সেদিনকার রুট্ মার্চের যা উদ্দেশ্য ছিল, তা বোধহয় সফল হয়েছে।

ক্যাম্পে ফেরার হুকুম হ'লো।

অনেক চেষ্টা ক'রেও পা মিলিয়ে মার্চ করা গেল না। হাত, পা, এমন কি সমস্ত শরীর থেকে থেকে থর্‌থর্ ক'রে কেঁপে উঠছে।

হুকুম হ'লো ছোট ছোট স্কোয়াড্ ক'রে ক্যাম্পে ফেরার।

স্যাপার পালকে একটু চাঙ্গা ক'রে তুলে আমরা সর্বশেষ স্কোয়াড্ রওনা হ'লাম ক্যাম্প অভিমুখে। পালের জন্যে থেমে থেমে জিরিয়ে জিরিয়ে চলতে হ'লো। ফেরার স্বাভাবিক সময় এক ঘণ্টার জায়গায় লেগে গেল প্রায় দু'ঘণ্টা।

ক্যাম্পে ফিরে এন্, সি, পাল আবার অসুস্থ হ'য়ে পড়লো। প্রচণ্ড ভাবে কাঁপতে কাঁপতে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হ'য়ে গেল।

ওয়াটার বট্‌ল্ থেকে জল নিয়ে মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে থাকে কয়েকজন, আর দু'তিনজন টুপি দিয়ে বাতাস ক'রে চলেছে প্রাণপণে। কিছুক্ষণ পরে স্যাপার পালের জ্ঞান ফিরলো।

সে এক অভিনব জ্ঞান ফেরা!

জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে এলো প্রবল এক কান্নার আবেগ। বত্রিশ বছরের এক পরিণত যুবকের মধ্যে দিয়ে যেন অবোধ এক শিশুর কান্না।

এমন সময়ে ব্যারাকে ঢুকলেন হাবিলদার মেজর সাহেব। তাঁকে কে যেন খবর দিয়েছে পালের অসুস্থতা সম্পর্কে।

স্থাপার পালের পাশে এগিয়ে এসে অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে বললেন, পাল যে আবার অজ্ঞান হ'য়ে গেছে, এ খবর আমাকে পাঠাওনি কেন ?

এতক্ষণ ধ'রে যে ক্রোধকে মনের মধ্যে দাবিয়ে রেখেছিলাম, সেই রাগ ওই মোলায়েম স্বরের মিষ্টতায় বুঝিবা আল্‌গা হ'য়ে যায়। কিছুতেই কথা বলবো না ঠিক ক'রে প্রাণপণে ঠোঁট কামড়ে ধরলাম।

কিন্তু যথাযথ উত্তর হাবিলদার মেজর সাহেব ঠিকই পেলেন আর একজনের কাছ থেকে। বিকৃত এক স্বর ব'লে উঠলো, কেন! খবরটা পেলে বুঝি আরও একবার ক্রল্‌ করিয়ে দেখাতেন ?

কর্তৃপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একজন সৈনিক উদ্ধত ভঙ্গিতে চ্যালেঞ্জ করছে—এমন ঘটনা ইতিপূর্বে এই কোম্পানিতে ঘটেনি।

হাবিলদার মেজরের প্রশ্নের জবাব দিয়েছে স্থাপার দাস, পয়েণ্টসম্যান।

কিন্তু এ স্বরকে বুঝবার মতো মনের অবস্থা সামরিক কর্তৃপক্ষের থাকে না। হাবিলদার মেজরের পদে যে থাকে, সে সর্বদাই 'জী হুজুর' শুনতেই অভ্যস্ত।

তার ব্যতিক্রম দেখেই বোধহয় হাবিলদার মেজর সাহেব বিস্মিত হয়েছিলেন। দাসের দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, কি বললে ?

কোম্পানির মধ্যে অত্যন্ত নিরিহ মানুষ হিসাবে স্থাপার দাসের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। সেই নিরিহ মানুষটি বুঝিবা পাগল হ'য়ে

গেছে। পালের পাশ থেকে নেমে গিয়ে একবারে হাবিলদার মেজরের মুখোমুখি দাঁড়ালো। ব্যারাকের দরজার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললে, ভালো চান তো এখনই এই ব্যারাক থেকে চ'লে যান। পালের ভালো-মন্দ আপনাকে দেখতে হবে না। আপনার মতো নর-পিশাচকে সে যদি এখন একবার দেখে, তাহ'লে হয়তো আঁতকে উঠে ম'রেই যাবে।

হাবিলদার-মেজরের মুখখানা আরক্ত হ'য়ে ওঠে। অপমানটা তাঁরও গায়ে বেঁধে। হাবিলদার মেজর হ'লেও একজন মানুষ তো! কিন্তু পদমর্যাদার নেশা বোধহয় ভুলিয়ে দেয়, মূলতঃ তিনি একজন মানুষ। তাই তখনও তিনি আশা রাখেন, তাঁর হাতের ওই ক্রাউনের দাপটে স্যাপার দাসের প্রগলভতা তিনি স্তব্ধ ক'রে দিতে পারবেন।

প্রচণ্ড এক ধমকের স্বরে চিৎকার ক'রে উঠলেন হাবিলদার মেজর সাহেব, মুখ সামলে কথা বলো বলছি—

স্যাপার দাস বোধহয় ততক্ষণে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। কয়েকটা মুহূর্ত সে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কেবল তার সমস্ত দেহটা পা থেকে মাথা পর্যন্ত কয়েক বার আগে-পিছে দুলে উঠলো। তারপর সে ঝাঁপিয়ে পড়লো হাবিলদার মেজরের ওপর।

তার পরের ঘটনা অত্যন্ত সরল।

কয়েকজন মিলে স্যাপার দাসের বজ্রবেষ্টনী থেকে হাবিলদার মেজরকে ছাড়িয়ে নিলে। গায়ের ধুলো ঝেড়ে হাবিলদার মেজর সাহেব আপিসের দিকে চ'লে গেলেন।

স্যাপার দাসের জ্ঞানশূন্য দেহটা একটা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কয়েকজনে তার শুশ্রূষা করতে থাকে।

ক্যাম্পের সমস্ত লোক ততক্ষণে ওই ব্যারাকটায় জমায়েৎ হ'য়ে গেছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই স্থাপার দাসের ডাক পড়লো অর্ডারলি রুমে। যতক্ষণ বিচার চলে ক্যাম্পের অধিকাংশ লোক আপিস ঘরের বাইরে অপেক্ষা করতে থাকে স্থাপার দাসের জন্যে।

পাঁচ মিনিটে বিচার হ'য়ে গেল।

চৌদ্দ দিনের শক্ত্ কয়েদ।

মাত্র চৌদ্দ দিন! সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলাম। এটা যে কোর্ট মার্শালের কেস্।

ঘটনার পটপরিবর্তন দ্রুততর হ'য়ে ওঠে।

পঁয়তাল্লিশ সালের ৮ই মে, জার্মানি বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ করলো।

বার্লিন পতনের খবরে আমরা উল্লসিত হয়েছিলাম। মেতে উঠেছিলাম উৎসবের আনন্দে। কর্তৃপক্ষের হুকুম দেওয়া আনন্দ ছাড়াও মনের অন্তরতম কোণ থেকে অভিনব এক আনন্দ যেন উপচে উঠেছিল।

সে এক অদ্ভুত উৎসব। চোখের জলে ভেসে যাওয়া আনন্দে উন্মাদ হ'য়ে উঠেছিলাম। এই আনন্দের মূলে একটি কথাই সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল।

মুক্তি!

মিলিটারী জীবন থেকে, অর্থাৎ নরক থেকে মুক্তি!

যে জার্মানির ওপর একদিন ভারতের স্বাধীনতার বাজি ধরেছিলাম, সেই জার্মানির পরাজয়ে আমরা আনন্দের কী কারণ পেলাম?

এ ক্ষেত্রেও ছিল মুক্তির আনন্দ। সে মুক্তি, পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্তি। তখন আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গভীরতর হয়েছে। আমরা বিশ লক্ষ ভারতীয় সৈনিক ভারতের মুক্তির জন্যে হয়তো বা কিছু করতে পারি। আমরা সশস্ত্র, আমরা যুদ্ধবিদ্যায় সুদক্ষ,

আর আমরাই নির্যাতিত, নিপীড়িত, প্রতি পদে পদে অপমানিত।

কোহিমা যুদ্ধের দিনগুলোতে 'রাজার মাথায় যে গাধার কান' আমরা দেখেছিলাম, আমাদের সেই দৃষ্টিশক্তিতে আবিলতা আসেনি। অধীর আগ্রহে আমরা অপেক্ষা করছিলাম এমন কারও আহ্বান, যে ডাক দিয়ে বলবে, এসো যুদ্ধের শেষ উপযুক্ত ভাবেই করো। ভারতের বুক থেকে বৃটীশের শেষ চিহ্নটুকু অপসারিত ক'রে ভারতের বুকে যুদ্ধের হানাহানি চিরতরে বন্ধ করো।

যাঁদের ওপর আশা ছিল সব চেয়ে বেশী, তাঁরা তখন বার্লিন পতনের বিশ্বজোড়া তাৎপর্য অনুশীলনে ব্যস্ত। আর বাকীরা কালমেমীর লঙ্কাভাগের ফরমূলা কষতে বিব্রত।

আমরা যে অনাথ, সেই অনাথই র'য়ে গেলাম।

জাপানের পতন তার তিন মাস পরেই।

যুদ্ধের পালা শেষ হ'লো।

কোম্পানিতে নতুন ক'রে সাড়া জেগেছে। এসে গেছে রিলিজ্ রোল্ তৈরী করার হুকুম হেড্ কোয়ার্টার্স্ থেকে।

দিন গোনার পালা হ'লো সুরু। আমাদের মিলিটারী চাকরীর মেয়াদ ছিল, for the duration of war and twelve months thereafter if so longer required. সুতরাং সেপ্টেম্বরের দু'তারিখ থেকে মুক্তির দিন এগিয়ে আসতে থাকে।

প্রতিদিনই দিন গুনে হিসাব করি, আর কত দিন বাকী।

ওঃ কি বিলম্বিত এই দিনগুলি!

যুদ্ধশেষের আনন্দ আমাদের কাছে অনাবি
আনন্দ মনের মধ্যে হরিষেবিষাদ জাগায়।

মিলিটারী জীবনে এতো জ্বালা, এতো যন্ত্রণা, পদে পদে এতো

অপমান, পরাধীনতার এতো গ্লানি যে মুক্তির আনন্দ পলায়নী মনোবৃত্তিতে রূপান্তরিত হয়। তবুও আমরা খুশী হই, আসন্ন মুক্তির আশায়।

কিন্তু মুক্তি মানে তো ঘরে ফেরা। ঘরে ফেরা মানে আবার বেকার দশা। আবার সেই অভাব অনটনের সঙ্গে নিত্যকার লড়াই। যে লড়াই মানুষকে হীনতর ক'রে তোলে। সঙ্কীর্ণতা মনের আনাচে কানাচে বাসা বাঁধে। অভাব অনটনের টানা-হেঁচড়ার মধ্যে মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো ম'রে যেতে থাকে। রাস্তার খেঁকি কুকুরের মতো একমুঠো ভাত নিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি!

আমাদের জন্যে শান্তি কোথায় ?

মনিপুর রোড স্টেশনের ওয়েস্ট ইয়ার্ডে লাইনের ওপর মরচে ধরতে সুরু করেছে। দুই লাইনের মাঝখানে আগাছা গজিয়ে উঠছে অবাধে। হয়তো আর কিছুকাল বাদে এই লাইনগুলো মাটির তলায় চাপা প'ড়ে যাবে।

এই লাইনগুলো যেন আমাদের পরমাত্মীয়ের মতো। এই লাইনের ওপর সান্টিং ইঞ্জিনের চাকার তলায় আস্ত একখানা হাত দিয়ে দিয়েছে ত্রিচিনপল্লীর ছেলে এস্, আরোকিয়াস্বামী। তাজা একটা প্রাণ ঢেলে দিয়েছে মজঃফরপুরের মবারক হোসেন। গাড়ীর তলায় প'ড়ে জীবন সংশয়াপন্ন হ'য়ে উঠেছিল রমণীরঞ্জন বসুর।

প্রায় তিনটি বছর ধ'রে এই লাইনগুলোকে নিয়েই কেটেছে আমাদের প্রতিটি দিনের পরিক্রমা। এই লাইনগুলোই যেন আমাদের শরীর-মনের শিরা-উপশিরায় পরিণত হ'য়ে গিয়েছিল।

এ সব ফেলে চ'লে যেতে হবে।

আসামে থাকার প্রয়োজন আমাদের ফুরিয়ে গেছে।

সুদীর্ঘ দু'বছর দশ মাস পরে ক্যাম্প গুটানোর দিন এলো। ডিমাপুরের ক্যাম্প হ'য়ে উঠেছিল আমাদের ঘর-বাড়ী। প্রতিদিনের তিল তিল পরিশ্রম দিয়ে ক্যাম্পটাকে একটা উপনগরীতে পরিণত ক'রে ফেলেছিলাম।

সেই ক্যাম্প ছেড়ে যেতে হবে।

মন কেমন করেছিল। সত্যিই মনটা ভারী হ'য়ে উঠেছিল। এই ক্যাম্পের ধূলিকণার সঙ্গেই তো মিশে রয়েছে মোহিন্তর চিতার ছাই। আর এরই আঙ্গিনায় মাটির তলায় রয়েছে মবারক হোসেনের কবর।

আর রয়েছে এইচ্, আর, বোসের লাগানো লাউয়ের চারা। তার ডগা লক্‌লকিয়ে ব্যারাকের চালে উঠছে। ব্যারাকের সামনে সামনে গাঁদার ঝাড়। তাতে সবেমাত্র কুঁড়ি ধরেছে।

এই ক্যাম্পের জীবনই তো আমার মিলিটারী জীবনের ইতিহাস। চারবার কয়েদ খেটেছি। অফিসারদের কাছে যতো বিরাগভাজন হয়েছি—কোম্পানির লোকের কাছে আর শতগুণ ভালোবাসা পেয়েছি। এইখানেই তো আমরা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর মতো মনোবল খুঁজে পেয়েছিলাম।

সেই জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে।

এসে গেছে রিলিজ্ অর্ডার। আমাদের ফিরে যেতে হবে হেড্ কোয়ার্টারস্ জলন্ধরে। পাওনা গণ্ডা হিসাব ক'রে দিয়ে আমাদের তারা ছেড়ে দেবে। তাদের কাছে আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

আমাদের জীবনটাই বুঝিবা যাযাবর যুগের!

জলন্ধর যাওয়ার পথে দানাপুরে কয়েক মাসের জন্য হল্ট করতে হ'লো।

তখনও নাকি আরও একটু কাজ বাকী র'য়ে গেছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের দানাপুর ডিভিসনের ডিভিসন্যাল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি বললেন, যুদ্ধের আগে লোকে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ট্রেণ দেখে ঘড়ি মেলাতো। যুদ্ধের সময় সে সময়ানুবর্তিতার ওলটপালট হ'য়ে গেছে। সেই সুনাম পুনরুদ্ধারকল্পে আমাদের তাঁকে সাহায্য করতে হবে।

সুতরাং আমরা দানাপুর র'য়ে গেলাম।

দানাপুর রেলওয়ে কলোনির সাহেবপাড়ায় হকি গ্রাউণ্ডে আমাদের ক্যাম্প পড়লো।

কোম্পানিটা হ'য়ে গেল তিনভাগ। হেড্‌কোয়ার্টারস্ রইলো দানাপুরে শ'দুয়েক লোক নিয়ে। গয়া আর ঝাঁঝায় হ'লো দুই ডিট্যাচ্‌মেণ্ট। এক এক ডিট্যাচ্‌মেণ্টে একশো ক'রে লোক এবং একজন ক'রে অফিসার।

আবার আমার ডাক পড়লো হেড্ কোয়ার্টারস্ আপিসে।

রিলিজ রোল্ তৈরী করতে হবে। তার জন্যে অনেক কাজ। মাথা পিছু ডজন খানেক ক'রে ফর্ম ভর্তি করা, তা ছাড়াও আরও যেন কত কি!

কোম্পানি আপিসের এখন অন্য চেহারা। সার্জেণ্ট পীটার্স নেই, মোহিন্ত নেই—নেই গোড়ার দিককার আরও অনেকে। কিন্তু প্রৌঢ় মজুমদার মশাই ঠিকই আছেন পুরনো আর নতুন দিনের মাঝখানে অবিচল সেতু।

সুলতান এখন হেড ক্লার্ক! আর আছে মনাফ, মাইকেল পুরনোদের মধ্যে। নতুন এসেছে সুন্দরম্ আর ডি, কে, লাহিড়ী।

সমস্ত কোম্পানি জুড়ে কাজের নেশা। সেই একই কাজ। সেই স্টেশন মাস্টার, গার্ড, সিগন্যালার, পয়েণ্টস্‌ম্যান, ড্রাইভার,

ফায়ারম্যান্, ফিটার—সেই লাইন ক্লিয়ার দেওয়া, সেই ঝাণ্ডা নেড়ে ট্রেণ ছাড়া, সেই টরেটক্ক বাজিয়ে চলা, সেই লিভার পাল্টানো, সেই হুইস্‌িল দিয়ে ষ্টিম খুলে দেওয়া, সেই বয়লারে কয়লা ঝাঁকা—সবই সেই একই।

তবু যেন সবই মনে হয় কত নতুন! যুদ্ধের দিনে ছিল কাজের মধ্যে উদ্দাম বেপরোয়া ভাব। ভাঙ্গুক-চুরুক, রেলের চাকা বন্ধ না হ'লেই হলো।

কিন্তু এখন যেন শান্ত সংযত ভাব। নিপুণভাবে কাজটি শেষ করা! যুদ্ধের আগের সুন্দর দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

মেজর ষ্টারলিং নতুন ও, সি। ইংলণ্ড থেকে আমদানি খাস বিলেতি সাহেব। তিনি নাকি লেবরপন্থী, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রবাদী! ইংলণ্ডে ছিলেন সুইচম্যান্, আমাদের দেশে যাকে বলা হয় পয়েণ্টসম্যান। যুদ্ধের দৌলতে ভারতে এসে তিনি মেজর হয়েছেন। খোশ মেজাজের লোক। সকল ব্যাপারেই তিনি খুশী। মেজর হওয়ার জন্যেও খুশী—ভারতে আসার জন্যে আরও খুশী।

দানাপুরে এলাম নভেম্বরের শেষাশেষি।

মনিপুর রোড থেকে দানাপুর—যেন দুই দেশ।

মনিপুর রোড—পাহাড়ে ঘেরা, সর্বদা স্যাঁতস্যাঁতে, প্রকৃতির কোলঘেঁষা আদিম এক ভূখণ্ড। শহর নগর বহু দূরে দূরে, সভ্যতর জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

দানাপুর—শুকনো খটখটে। প্রকৃতির কোল থেকে কেড়ে নেওয়া মানুষের সৃষ্ট এক শহর! এখানকার মানুষ আজকের দিনেই বাস করে। এখান থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় সাটল্ ট্রেণ যায় পাটনায়। সভ্যতর জীবনের মধ্যে আবার যেন ফিরে এলাম। কেমন যেন

সিভিলিয়ান সিভিলিয়ান একটা ভাব ঘনিয়ে আসছে মনের মধ্যে।

সারাদিন আপিসে কাজ চলে। সন্ধ্যের পর সময় কাটে কিছুক্ষণ খগোল বাজারে, আর বেশীটা সময় ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে। আপ'এর গাড়ী দিল্লী চলে, ডাউনের গাড়ী কলকাতায় যায়। চেয়ে চেয়ে দেখি ট্রেণের যাত্রীদের। মনে হয়, কতকাল বুঝি মানুষ দেখিনি।

প্ল্যাটফরমের টি-স্টলে চা খাই আর হুইলারের স্টলে বই দেখি। কতো বই। বাঙলা বই, ইংরেজী বই, হিন্দী বই, উর্দু বই—বইগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করি। জীবনের স্পর্শ যেন গভীরতর ক'রে পাই। ওঃ কতকাল বই কি বস্তু যেন চোখে দেখিনি।

রাতে লাইট আউটের আগে পর্যন্ত তাঁবুর মধ্যে শুয়ে গল্প চলে। বাড়ী ফেরার গল্প। পরিকল্পনা গ'ড়ে উঠতে স্বুরু করেছে ইতিমধ্যেই। রিলিজের টাকা নিয়ে কে কি করবে, তারই জল্পনা কল্পনা।

মজুমদার মশাই কাশীবাসী হবেন। মনাফ কারবারে নামবে। মাইকেলই শুধু কিছু বলে না।

মাইকেল কলকাতার নিম্নবিত্ত এক ভারতীয় খ্রীস্টান। সে আর তার প্রৌঢ়া মা—এই নিয়ে তার সংসার। অনন্যোপায় হ'য়েই মিলিটারীতে ঢোকে। চুয়াল্লিশ সালে সে বিয়ে করে। কিন্তু মিলিটারী কেরাণীর রোজগারে কলকাতায় বাস ক'রে দুটো মুখের অন্ন সংস্থান হওয়া অসম্ভব। মাইকেলের বো হাসপাতালের চাকরী জোগাড় করলো। সংসার ভালোই চললো। কিন্তু নতুন বো প্রবাসী স্বামীর পথ চেয়ে মনের রাশ ধ'রে রাখতে পারলো না। নতুন জীবনে নতুন মানুষ তাকে আকৃস্ট করেছে। মাইকেলের বো ডাইভোর্সের জন্যে অনুরোধ জানিয়েছে—সে নাকি অবৈধভাবে অন্তঃসত্ত্বা।

মাইকেল ডাইভোর্স মঞ্জুর করেছে।

তবুও, সকলে ঘুমিয়ে পড়লে মাইকেলের সরব দীর্ঘশ্বাস কানে আসে।

বছর ঘুরে গেল।

নতুন বছরে কেমন যেন নতুন নতুন খবর। সারা দুনিয়াটা জুড়ে যেন ওলট পালটের তাণ্ডব সুরু হয়েছে। জাপান অধিকৃত এশিয়ার দেশে দেশে কারা যেন মাটির তলা থেকে মাথা চাড়া দিচ্ছে।

ক্যাম্পে অনেক রকম খবর-কাগজ আসে। প্রায় সব রকমই। কোম্পানির তরফ থেকে ষ্টেটস্‌ম্যান আর ফৌজী আকবর। কোম্পানির লোকেরা খগোল বাজার থেকে কেনে নিজেদের পছন্দমত কাগজ। মেজর ষ্টারলিং লেবরপন্থি—এ সব ব্যাপারে একেবারেই উদার।

কাগজে কাগজে নতুন নতুন খবর। নানান খবর। দেশের খবর। বিদেশের খবর। যুদ্ধ থামার খবর। আবার কোথাও কোথাও ক্ষমতা দখলের জন্যে নতুন ক'রে যুদ্ধ লাগার খবর।

তারই মাঝে মাঝে ছোট ছোট ইঙ্গিতের মতো ভারতস্থ সেনাবাহিনীর খবর। রয়্যাল্ এয়ারফোর্সের ধর্মঘটের খবর! সিগন্যাল কোরের বিক্ষোভের খবর!

ধর্মঘট! বিক্ষোভ! এ সব যেন আমাদের কাছে নতুন কথা।

আমরাও ভাবতে বসি।

রয়্যাল এয়ারফোর্স মানে খাস্-বৃটীশ বিমান বাহিনী। তাদের মধ্যেও কি আমাদের মতো হাভাতেরা এসে জুটেছে! তারা তো রয়্যাল্ অর্থাৎ রাজার জাত। তবুও তাদেরই গ্রাউণ্ড ষ্টাফ ধর্মঘটের গোড়াপত্তন করেছে। তারপর ছড়িয়ে পড়েছে সেই ধর্মঘট বৈমানিকদের মধ্যেও।

আজব ব্যাপার!

কিন্তু সিগন্যাল কোর তো আমাদের মতোই দেশী লোক নিয়ে গঠিত বাহিনী। নাম তাদের ইণ্ডিয়ান্ সিগন্যাল কোর। তারা নিশ্চয় রয়্যাল্ নয়। তবুও এতো সাহস তারা পায় কোথা থেকে! কন্‌স্পিরেসি ফর্ মিউটিনি'র ব্রহ্মাস্ত্রকেও কি ভয় করে না তারা!

কেমন একটা অদ্ভুত মনোভাব ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা ক্যাম্পময়। খবর পড়তে পড়তেই হয়তো ন ওঠে, আমরাও ধর্মঘট করবো।

কেন ধর্মঘট করবো? কিসের জন্য করবো? কি উদ্দেশ্যে করবো, তার জন্যে কোন মাথাব্যথা নেই। কিছু একটা আমরা করতে চাই। অনেক অবিচার, অত্যাচার, লাঞ্ছনা, অপমান, দিনের পর দিন সহ্য করেছি। এইবার আমরাও ফিরিয়ে দিতে চাই সেই আঘাত। ওদের শক্তি কোথায়, সে গোপন খবর আমাদের জানা হ'য়ে গেছে।

এমনই সময়ে খবর বার হ'লো রয়াল্ ইণ্ডিয়ান্ নেভির রেটিংদের বিদ্রোহের। তারা জাহাজ দখল করেছে, কামান ঘুরিয়ে ধরেছে বোম্বাইয়ের উপকূল মুখে। দশ দফা দাবী তারা পেশ করেছে।

নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারি, সৈনিক যখন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তখন সে শেষ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হ'য়েই করে।

সেইদিনই গভীর রাতে কে যেন আমাকে বিছানার মধ্যে গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকলে।

ঘুম ভাঙতে, সে প্রায় আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, বোসবাবু, একটু তাঁবুর বাইরে আসুন।

মশারী থেকে বার হ'য়ে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

নিশুতি রাত। সেদিন অমাবস্যা ছিল কিনা মনে নেই। আকাশে যে চাঁদ ছিল না, শুধু এইটুকুই মনে আছে। ফেব্রুয়ারী মাসের শীতের রাত, পাতলা কুয়াসার একটা আস্তরণ দূরের জিনিষগুলোকে আবছায়া ক'রে রেখেছে। আশেপাশে কেবল তাঁবুগুলোকে চেনা যাচ্ছে। সমস্ত ক্যাম্প জুড়ে প্রায় দু'শো ঘুমন্ত মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের এক ঐকতান।

সামনের মানুষটিকে দেখে চিনলাম,

বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করলাম, কি খবর রহমান্ এতো রাত্তিরে ?

রহমান বললে, গার্ড কমাণ্ডার সাহেব একবার আপনাকে ডাকছেন কোয়ার্টার গার্ডে। আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আর কেউ যেন জানতে না পারে।

চারিদিকের কুয়াসার মতোই রহস্যময় মনে হ'লো ব্যাপারটা !

অযথা প্রশ্ন না বাড়িয়ে, জার্সি পুল-ওভারটা গলিয়ে নিয়ে চললাম কোয়ার্টার গার্ডের দিকে।

সুরক্ষিত আমাদের এই ক্যাম্প। দানাপুর রেল কলোনির ইংরেজ পাড়ার মধ্যে হকি গ্রাউণ্ড। সেই গ্রাউণ্ডের তিন দিকে বড় বড় অফিসারদের বাড়ী। চতুর্থ দিকে ইংরেজদের সমাধিক্ষেত্র। এ পাড়ায় আজেবাজে লোক, অর্থাৎ সাধারণ লোকের আনাগোনাও নেই। আমরাই বোধহয় প্রথম এতোগুলো নেটিভ্ একত্রে এই এলেকায় প্রবেশাধিকার পেয়েছি।

গার্ডরুমের সামনে যেতেই দেখতে পেলাম গার্ড কমাণ্ডারকে।

মনে হ'লো, সে যেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। একটা স্টেন্-গান্ তার বাঁ কাঁধে শ্লিং-আর্ম করা।

গার্ড কমাণ্ডার আমার দিকে এগিয়ে আসতেই সেণ্ট্রা চ'লে গেল গার্ড রুমে।

ছোট্ট কোয়ার্টার গার্ড। অল্পই রসদ আছে। মাত্র ছ'জন লোক গার্ড ডিউটিতে। এন, সি, ও'র অভাবে মাঝে মাঝে ল্যান্স-নায়েককেই গার্ড কমাণ্ডার করা হচ্ছে।

ল্যান্স-নায়েক চক্রবর্তী সেদিনকার গার্ড কমাণ্ডার।

চক্রবর্তী বললে, বোসবাবু, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। একটু ওই দিকে চলুন।

গেটের পাশেই গার্ড টেন্ট। তার সামনে পীচঢালা রাস্তা। তার উল্টো দিকে সিমেন্ট্রির গেট্। বড় বড় নিম গাছের ছায়ায় সেখানটা ঘন অন্ধকার।

সেখানটায় আমরা মুখোমুখি দাঁড়ালাম। চক্রবর্তীর মুখখানা স্পস্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তার ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসছে।

আর যেন বুঝতে পারছি, চক্রবর্তী কী বলতে চায়!

সমস্ত শরীরটা থর্থর্ ক'রে কেঁপে উঠলো। গায়ের ওপরকার জার্সি পুল্-ওভারটাকে ওই কন্কনে শীতের মধ্যেও বাহুল্য মনে হ'তে লাগলো।

চক্রবর্তী ধরা-গলায় বললে, কোয়ার্টার গার্ড আমরা দখল ক'রে নিতে পারি বোসবাবু। আমার স্টেন্গান্টা লোড্ করাই আছে।

আমি বললাম, বেশ তো, কোয়ার্টার গার্ড আমরা দখল করলাম। কোম্পানির দুশো লোক এক হ'য়ে দাঁড়ালাম। সব ক'টা অফিসারকে—

কথা শেষ করতে না দিয়েই চক্রবর্তী বলে উঠলো, না না বোসবাবু, ওসব নয়। আমরা অফিসারদের বন্দী করবো।

চোখের ওপর থেকে সমস্ত কুয়াসা যেন কেটে গেল। সামনে বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পেলাম। হাত পায়ের কাঁপন থেমে গেল।

মুখের ঘাম মুছে নিয়ে বললাম, বেশ তাই হবে। আমরা সমস্ত

আফসারকে, অর্থাৎ এ ক্যাম্পের তিনজন বৃটীশ অফিসারকে বন্দী করলাম। তারপর আমরা কি করবো?

চক্রবর্তীর স্বরের দৃঢ়তা যেন অনেক ক'মে গেছে। বললে, তারপর আমাদের ডিট্যাচ্‌মেণ্টগুলোয় খবর দেবো।

এরপর অনেক কথা হয়েছিল চক্রবর্তীর সঙ্গে।

শুধু আমাদের কোম্পানির চারশো লোক আর পাঁচটি বৃটীশ অফিসার নিয়ে ভারতবর্ষ আর বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ নয়।

আজ আমরা এখনই ভীষণ একটা কিছু করতে পারি। যেমন করেছিল পাঁচনম্বর সি, এ্যাণ্ড এম্ গ্রুপ।

কিন্তু আমরাও তো সেদিন তাদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারিনি। আমাদের মাঝখানে কোন সেতু ছিল না। আমরা আজও খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত।

চক্রবর্তীর একটা হাত আমার ছুটি হাতের মধ্যে চেপে ধরেছিলাম। হয়তো অনেকক্ষণ সেই ভাবে নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকেছিলাম। বুক ভরা অভিমানে আর হতাশায় হয়তো চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল পড়েছিল।

অনেকক্ষণ পরে বলেছিলাম, আমরা সবই করতে পারতাম চক্রবর্তী, কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। কেন জানো? আমাদের দেশের নেতারাই আমাদের পরিত্যাগ করেছে।

মাথা নিচু ক'রে চক্রবর্তী গার্ড-রুমে ফিরে গেল।

আমি ফিরে এলাম আমার বিছানায়!

যে বিস্ময় নিয়ে সেন্ট্রীর ডাকে গার্ড-রুমে গিয়েছিলাম, তার চেয়ে অনেক গভীরতর বিস্ময় নিয়ে ফিরে এলাম। সেই অপরিসীম বিস্ময় নিয়ে দেখলাম, আমরা এই বিশলক্ষ সশস্ত্র ভারতীয়, আমরা ভারতের কেউ নই।

বিগত চার বছরের সৈনিক জীবনের ইতিহাসের পাতা এক লহমায় একের পর এক উল্টে যায়।

কী দেখলাম?

পেটের দায়ে কলঙ্কিত সৈনিকের উর্দি গায়ে চড়ালাম। জাত গেল, পেটও ভরলো না।

ক্রীপ্‌স্‌ মিশন ব্যর্থ হলো। জাতীয় নেতারা জেলে গেলেন।

সুযোগ সন্ধানীরা অপরূপ এক আন্দোলন সৃষ্টি করলো। সেই মেকি বিপ্লবী আন্দোলনে ভারতীয় সৈনিকেরা অখ্যাত হ'লো দেশদ্রোহীরূপে। যে প্রচণ্ড শক্তির অভ্যুত্থান ঘটলো, তা সামান্য একটা ভূমিকম্পের মতো বারেক কেঁপে উঠে থেমে গেল!

তার পর এলো দুর্ভিক্ষ।

তার সমস্ত দায়িত্ব আমাদেরই ঘাড়ে চাপিয়ে দিল তারাই, যারা কালো বাজারে এক এক কণা চালের দাম বুঝে নিলে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে।

যুদ্ধের ব্যাপারে বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না ব'লে যারা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিল, তারাই যুদ্ধোপকরণ তৈরীর প্রতিযোগিতায় দিনে তিন সিফ্‌টে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চালু করলো!

যুদ্ধের শেষে তারাই বিপ্লবী র'য়ে গেল; যারা একদা জাপানের পথ সুগম করতে চেয়েছিল। যারা দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি ক'রে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করলো, তারা দেশপ্রেমিকই র'য়ে গেল! যারা যুদ্ধোপকরণ তৈরী ক'রে শতগুণ ধনী হ'য়ে উঠলো, তারা দেশের সেবকই র'য়ে গেল।

আর যে বেচারীরা দু'মুঠো ভাতের জন্যে প্রাণের বিনিময়ে ষোলো টাকার সিপাই হ'য়ে ঢুকলো, তারা হ'য়ে গেল দেশের শত্রু!

এই এরাই যেদিন বোম্বাইয়ের উপকূলে রয়্যাল্‌ ইণ্ডিয়ান্‌ নেভির যুদ্ধজাহাজ দখল ক'রে কামান ঘুরিয়ে ধ'রে হুঙ্কার দিলে, বৃটীশ—ভারত

ছাড়ো, সেদিন জাতীয় নেতাদের চোখের ঘুম আর মুখের রুচি অন্তাহত হ'লো।

বিশ্ববিপ্লবের নেতারা চোখ কচলে আকাশের পানে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, এরা আবার কারা ?

শান্তির দূতেরা ছুটে গেল বিদ্রোহীদের কাছে। বললে, অস্ত্র পরিহার করো। ভারতের পূণ্যভূমিতে বিপ্লব খাপ খায় না! ভাইসরয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে আমরাই স্বাধীনতা এনে দেবো! আসছে কেবিনেট মিশন।

দানাপুরের মাঠে কুয়াসাচ্ছন্ন তাঁবুগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে পড়েছিল, বিয়াল্লিশ সালের আগষ্টের দিনগুলোর কথা। আর মনে হচ্ছিল, গার্ড কমাণ্ডার চক্রবর্তীর মনের কথা যদি জানতে পারতো ভারতের শহর নগরের মানুষেরা, ক্ষেত-খামারের কিষাণরা আর কল-কারখানার শ্রমিকরা! এমন কেউ যদি থাকতো, যে আগষ্টের ওই মহাশক্তির সঙ্গে চক্রবর্তীর ওই লোড-করা স্টেন-গানকে একই সারিতে দাঁড় করিয়ে দিতে পারতো!

কি বিচিত্র এক যুগ!

বিপ্লবের বীজ ভারতের মাঠে ঘাটে, গ্রামে গ্রামান্তরে, শহরে নগরে, এমন কি সেনা ছাউনির ব্যারাকে ব্যারাকে উদ্গত, অঙ্কুরিত!

তবুও ভারতের বিপ্লব অসম্পূর্ণ র'য়ে গেল।